Jatiya Andolane Satis Chandra Mukhopadhyay
by Uma Mukhopadhyay and Haridas Mukhopadhyay

প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৬০
দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ৬ই জুলাই, ১৯৯৬

প্রকাশক ঃ
রিডার্স সার্ভিস
৫৯/৫এ, গড়ফা মেন রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৫
দূরভাষ - ২৪১৮-০১৫৮

প্রচ্ছদ ঃ সৈকত ঘোষাল

অক্ষর বিন্যাস
মাইক্রোপ্রিন্ট কমিউনিকেশন্
১এ, রাজা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ ঃ
ডি. অ্যাণ্ড পি. গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
গঙ্গানগর, কলকাতা - ৭০০ ১৩২

আচার্য সতীশচন্দ্রের একান্ত স্নেহধন্য

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাবান পণ্ডিত। বহু বৎসর যাবৎ তাঁরা দু'জনে মিলে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের বিবর্তন সম্বন্ধে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনা করে তাঁরা তাঁদের গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ কিছুদিন পূর্বে দেশের বিদ্বৎসমাজের পক্ষ থেকে 'রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেছেন। তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি পাঠ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

বর্তমান গ্রন্থখানিও জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক, স্বদেশব্রতী চিন্তাগুরু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণ জীবনকথা ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় অন্য কোন পুস্তকে প্রচারিত হয়নি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দম্পতি সুদীর্ঘকাল গবেষণার পর এই মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করলেন।

ত্রিগুণা সেন

(উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ১৯৬০)

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ও স্বদেশী আন্দোলনের এক মহান অধিনায়ক। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই তিনি 'ডন' পত্রিকা ও 'ডন সোসাইটি' স্থাপন করে যুবসমাজকে গঠনমূলক স্বদেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯০৬ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্তি করেছিলেন, "সতীশবাবু যে সময় ডন সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না, শিক্ষা সম্পর্কীয় এই National Movement-এরও তখন সূত্রপাত হয় নাই। আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, সতীশবাবু তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন। তাঁহার উৎসাহেই ইহা অনুপ্রাণিত হইয়াছে।"

তৎকালে সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটিতে যে সকল কৃতবিদ্য তরুণ দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিনয়কুমার সরকার, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ মনীষীর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে পড়ে। তৎকালেই ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডন সোসাইটিকে "unique institution" বা অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বিনয়কুমার সরকার বহুদিন পর মন্তব্য করেছিলেন, "সতীশবাবুর আবহাওয়ায় পড়েছিলাম বলে জীবন ধন্য হয়েছে।"

বিংশ শতকের বঙ্গ-সংস্কৃতিতে সতীশচন্দ্রের দান অসামান্য। কিন্তু নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই নমস্য পুরুষটি একালের জনস্মৃতিতে বিস্মৃতপ্রায়। জাতীয় আন্দোলনের বহু কর্ম ও কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি প্রামাণ্য জীবনী এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। বিগত দিনের বহু মূল্যবান সাক্ষ্য ও প্রমাণের নিরিখে রচিত বর্তমান পুস্তকখানিকে ঐতিহাসিক গবেষণার এই বিশেষ পর্যায়ে প্রথম প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্রের স্থান ও বিশিষ্ট দান সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন পরলোকগত অধ্যাপক বিনয় সরকার। হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিনয় সরকারের বৈঠকে' নামক মোলাকাৎ গ্রন্থ (কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ৪৯০) প্রথম প্রকাশিত হ'লে পুস্তকের সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক 'আর্থিক উন্নতি' মাসিকে মন্তব্য করেছিলেনঃ "যত কথা আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডন সোসাইটি ও সতীশ মুখোপাধ্যায়। বিনয় সরকারের মতবাদ ও সমালোচনা হয়ত সকলে স্বীকার করবে না। একদিন হয়ত এ-সব মতবাদ ও সমালোচনা নিতান্ত সেকেলে হয়ে যাবে। কিন্তু ডন সোসাইটির কথা বাংলার জাতীয় ইতিহাস হতে মুছে যেতে পারবে না। তাই মনে হয় অন্ততঃ এই অংশটুকুর জন্য 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।"

বর্তমান গ্রন্থখানি "বিনয় সরকারের বৈঠকে'-র দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'লেও একমাত্র বিনয় সরকার পরিবেষিত তথ্যরাশির উপর নির্ভর করে রচিত হয়নি। এই পুস্তকে ব্যবহৃত তথ্যগুলি প্রধানত সতীশচন্দ্র-সম্পাদিত ও অধুনা লুপ্তপ্রায় 'ডন' পত্রিকার যোল খণ্ড (মার্চ, ১৮৯৭-নভেম্বর, ১৯১৩) এবং সতীশচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। অধিকন্তু, সতীশচন্দ্রের পুরানো ছাত্রদের সঙ্গে সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক মোলাকাতের ফলেও বহু নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্গত হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও কিশোরী মোহন গুপ্ত এবং শ্রীযুত কৃষ্ণদাস সিংহ রায় ও সতীশচন্দ্র গুহ। তাঁদের প্রদত্ত কোন কোন তথ্যের যাথার্থ্য বিচারের উদ্দেশ্যে আমরা বহুদিন ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। তাছাড়া, শ্রীসুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ও আমাদের অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতা ঁমতিলাল গাঙ্গুলীর (সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়) লেখা "স্মৃতি-কথা" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক ও সংস্কৃতি-সাধক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ও সতীশচন্দ্র সম্পর্কিত কোন কোন নতুন তথ্য আমাদের দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। সতীশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসঙ্গী অধ্যাপক কে. পি. এস. মালানি ও শ্রীপ্রভাত চন্দ্র দাঁ মহাশয়ও আমাদের গবেষণার পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি 'জয়শ্রী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৬৪ সংখ্যায়

ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু প্রথম আলোচিত হয় 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৫৯)। তৃতীয় অধ্যায়টি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৬৩ সনে 'জয়শ্রী' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়টি প্রথম ছাপা হয় 'ইতিহাস' ত্রৈমাসিকে (ফাল্গুন, ১৩৫৯—বৈশাখ, ১৩৬০), আর পঞ্চম অধ্যায়টি ১৩৬৬ সনের 'জয়শ্রী' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ রচনা ইতিপূর্বে 'জয়শ্রী' পত্রিকায় (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৪), দৈনিক 'বসুমতী'তে (২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৭) ও 'যুগান্তর' সাময়িকীতে (২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮) প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় পরিশিষ্টে প্রদত্ত রচনাটি লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পুস্তক প্রকাশের কাজে যাঁদের সহৃদয়তা ও সুপরামর্শ আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে প্রেরণা জুগিয়েছে, তাঁদের মধ্যে স্বামী অসীমানন্দ মহারাজ ও অধ্যাপক শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। "রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়"-প্রণেতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাস গ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের নানা সুপরামর্শ দিয়েছেন বলে তাঁর কাছেও আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি ও প্রুফ দেখার ব্যাপারে আমরা শ্রীমতী চিত্রলেখা গঙ্গোপাধ্যায় ও অনুরাধা মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি। বস্তুত তাদের দু'জনের সহায়তা না পেলে পুস্তক এত শীঘ্র বের হতো কিনা সন্দেহ।

"শিক্ষাতীর্থ"
১২/৫, ফার্ন রোড, কলিকাতা - ১৯
১৫ই মার্চ, ১৯৬০

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
উমা মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৬০ সনের এপ্রিল মাসে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রবাদপ্রতিম শিক্ষাবিদ ডক্টর ত্রিগুণা সেনের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায়। বইখানি সম্বন্ধে ডক্টর সেন সেই সময়েই লিখেছিলেন, "স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক, স্বদেশব্রতী চিন্তাগুরু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণ জীবনকথা ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় অন্য কোন পুস্তকে প্রচারিত হয়নি।" বিয়াল্লিশ বছর পর গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। 'রিডার্স সার্ভিস'-এর শ্রীমতী তন্দ্রিতা চন্দ্র ও রমাপ্রসাদ চন্দ্র গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের সকল দায়িত্বভার সানন্দে গ্রহণ করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে-র অফুরান প্রেরণা আমাদের জীবনে স্মরণীয় ঘটনা।

আমাদের গ্রন্থখানি বের হবার পর সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অগ্রণী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হলো "আচার্য সতীশচন্দ্র ঃ পত্রাবলী" (১৯৮১), Selected Works of Acharya Satish Chandra Mukherjee (Vol. I, 1988; Vol. II, 1993), আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ত্রয়ী ঃ আচার্য সতীশচন্দ্র, গান্ধীজি ও কৃষ্ণদাস" (১৯৯৬), হরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত "যুগপ্রবর্তক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়," এবং হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় বিরচিত *The Origins of the National Education Movement* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (জুন, ২০০০)। আচার্য সতীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে ধন্য (১৯৪৪-৪৮) ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত "মহাজন সংবাদ" গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত প্রথম সংস্করণ (জানুয়ারি -১৯৯৯, বইমেলা প্রকাশন) আধুনিক বাংলার ধর্ম-সাধনা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একখানি মহামূল্য সংযোজন।

ইতিমধ্যে সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে "রাষ্ট্রীয়তা ঔর স্বদেশী আন্দোলন" শিরোনামায় (দিল্লী, ১৯৯৮)। গ্রন্থকার আচার্য সতীশচন্দ্রের একলব্য শিষ্য সতীশচন্দ্র গুহ-র পুত্র শিক্ষাবিদ বেনারসবাসী

সুব্রত গুহ। গ্রন্থকার বাল্য বয়সে সতীশচন্দ্রকে বহুবার দর্শন করেছিলেন ও তাঁর স্নেহধন্য হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার অল্পদিন পরেই তাঁর নশ্বর দেহের অবসান ঘটে।

এর পরবর্তী ঘটনা সতীশচন্দ্র সম্পাদিত, ষোল খণ্ডে সমাপ্ত ঐতিহাসিক "দ্য ডন" *(The Dawn)* পত্রিকার-পুনর্মুদ্রণের আয়োজন ও ডনের প্রথম খন্ডের (১৮৯৭-৯৮) পুনর্মুদ্রণ (ডিসেম্বর ১৯৯৯)। করুণ কিরণ চক্রবর্তী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র দু'জনে মিলে এই মহান কর্মযজ্ঞে হাত দিয়েছিলেন। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় ডনের দ্বিতীয় খণ্ডটি (১৮৯৮-৯৯) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে জুন ২০০১ সনে। উভয় খণ্ডের প্রকাশনার সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। প্রথম খণ্ডে সংযুক্ত হয়েছে সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে লেখা আমাদের একটি সুদীর্ঘ মুখবন্ধ বা Foreword, দ্বিতীয় খণ্ডে সংযুক্ত হয়েছে একটি নাতিদীর্ঘ Foreword। উভয় খণ্ডেরই সম্পাদনার কাজে ব্রতী ছিলেন অধ্যাপক মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র। ঐ ঐতিহাসিক পত্রিকার তৃতীয় খণ্ড এখনও প্রকাশিত হয়নি।

সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে ডক্টর চিত্তব্রত পালিত গত কয়েক বছর ধরে একটা নতুন দিক নিয়ে যে গবেষণা করে চলেছেন তার প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর নবপ্রকাশিত *Satis Chandra Mukherjee, The Dawn Society and National Science* গ্রন্থখানিতে।

বইয়ের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে ও প্রুফ দেখার নিরস কাজে আমাদের পুত্রবধূ অধ্যাপিকা ডঃ জয়া মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাস্পদ ছাত্রী অলকানন্দা বসুর কাছ থেকে আমরা যে অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি তা ভুলবার নয়।

আমাদের গ্রন্থের এই সংস্করণটি জ্ঞানতাপস ও মহান শিক্ষাব্রতী ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের করকমলে উৎসর্গ করে আমরা কৃতার্থ বোধ করছি।

।। সূচীপত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা	ক
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা	ঘ
সতীশচন্দ্রের বাল্য ও যৌবন	১-১৪
'ডন' পত্রিকা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ	১৫-২৮
জাতীয় আন্দোলনে 'ডন' সোসাইটি	২৯-৪৫
'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ	৪৬-৫৯
সতীশচন্দ্রের শেষ জীবন	৬০-৭৮

পরিশিষ্ট

(ক)	ঊনবিংশ শতকে বাংলার সমন্বয় সাধনা	৭৯-৮৯
(খ)	'ডন' সোসাইটি ও ভগিনী নিবেদিতা	৯০-১০২
(গ)	অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	১০৩-১০৭
(ঘ)	জ্ঞানতাপস হারাণচন্দ্র চাকলাদার	১০৮-১১৪
(ঙ)	দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের দুইখানি পত্র	১১৫-১১৯
(চ)	Causes of the Decline of the Brahmo Samaj : A Reassessment	১২০-১২৪

প্রথম অধ্যায়

সতীশচন্দ্রের বাল্য ও যৌবন

॥ ১ ॥

আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮) নয়া বাংলার এক বিরাটতম পুরুষ। বিংশ শতকের নবীন ঊষায় যে সকল দিক্‌পাল মনীষী জাতির কানে শুনিয়েছিলেন আত্মশক্তির অমোঘ মন্ত্র, যাঁদের নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবার অগ্নিবাণীতে ১৯০৫ সনের বাংলা তথা ভারত জেগে উঠেছিল, 'ডন'-এর সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল বা অরবিন্দ ঘোষের মতন তিনি অবশ্য প্রকাশ্য রাষ্ট্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও কর্মের সাক্ষাৎ ও নিবিড় সংযোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতরে যে তীব্র স্বাদেশিকতার আবেগ ও আলোড়ন দেখা দেয়, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন তিনি। বস্তুত, ১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনার বহু পূর্বেই তিনি 'ডন সোসাইটি'-র (জুলাই, ১৯০২ সনে প্রতিষ্ঠিত) মাধ্যমে ঐ আন্দোলনের আংশিক গোড়াপত্তন করেছিলেন। ১৯০৬ সনে জাতীয় কর্তৃত্বে 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বাংলায় যে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার কেন্দ্রস্থলে তিনি ছিলেন দণ্ডায়মান। ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, শিল্পকলা, দর্শন ও সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। যৌবনের প্রারম্ভে 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'-র মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে তিনি দেশপূজার মহাযজ্ঞে জীবন সমর্পণ করেন। নামযশের প্রলোভন বিষবৎ বর্জন ক'রে তিনি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন মাতৃভূমির সেবায় ও সাধনায়। স্বার্থত্যাগের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে যারপরনাই বিরল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নমস্য পুরুষটি একালের জনস্মৃতিতে বিস্মৃতপ্রায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ও স্বাধীনতা-যুদ্ধের আর দুইজন প্রধান অধিনায়ককেও আমরা একালে প্রায় ভুলতে বসেছি। তাঁরা হলেন বিপিন চন্দ্র পাল ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

॥ ২ ॥

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার অন্তর্গত বন্দীপুর গ্রামে ১৮৬৫ সনের ৫ই জুন জন্মগ্রহণ করেন।[১] বন্দীপুর গ্রাম

---

(১) সতীশচন্দ্রের ভাগিনেয় রায় বাহাদুর মতিলাল গাঙ্গুলীব অপ্রকাশিত "স্মৃতি-কথা"য় উক্ত তাবিখেব উল্লেখ দেখা যায়। মতিলালবাবু এক সময় ভারত সরকারের কাবেন্সি বিভাগে উচ্চপদস্থ অফিসাব ছিলেন।

তারকেশ্বর লাইনের নালিকুল ষ্টেশন থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তৎকালে এই স্থানে অনেক বিদ্বান ও বিত্তশালী লোকের বসতি ছিল। গ্রামের জমিদার ছিলেন নীলমণি মিত্র। পাঠশালা ছাড়া একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সতীশচন্দ্রের পিতা ছিলেন কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণনাথের তিন পুত্র যথাক্রমে ছিলেন বিধুভূষণ, সতীশচন্দ্র ও তিনকড়ি। কৃষ্ণনাথ ছিলেন জজ দ্বারকানাথ মিত্রের (১৮৩৩-৭৪) সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে অনুবাদকের চাকুরী করতেন। উড়িয়া ভাষা থেকে ইংরেজীতে দলিল-পত্রাদি অনুবাদ করাই ছিল তাঁর পেশা। তিনি যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত কঁৎ প্রচারিত "পজিটিভিষ্ট" দর্শনের সেবক ছিলেন। পজিটিভিজ্‌মের মর্মার্থ হলো নিরীশ্বরবাদ এবং মানব-পূজা ও সমাজসেবার ধর্ম। দ্বারকানাথ মিত্র বাংলাদেশে "পজিটিভিষ্ট" দর্শনের অন্যতম আদি প্রচারক ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন ও অগাস্ত কঁতের দর্শন মূল ফরাসীতে অধ্যয়ন করেন।[২] তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষ্ণনাথও ফরাসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন ও পজিটিভিষ্ট দর্শনের অনুগামী হয়ে ওঠেন। তৎকালীন নামকরা পজিটিভিষ্টদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য ছিল। স্যার হেনরী কটন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মাঝেমাঝে তাঁর ভবানীপুরস্থ বাটিতেও আসা-যাওয়া করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তালতলাতে বাঙালি পজিটিভিষ্টদের যে ক্লাব ছিল, কৃষ্ণনাথ তারও একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন।[৩] অন্যান্য সদস্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W.C. Bonnerjee), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের সকলের সঙ্গেই কৃষ্ণনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মিক সংযোগ ছিল। তৎকালে আর একজন নামকরা পজিটিভিষ্ট ছিলেন স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র। তাঁর সঙ্গেও কৃষ্ণনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কৃষ্ণনাথ ভাল সেতার বাজাতে পারতেন। সেই বাজনা শুনতে রমেশচন্দ্র প্রায়ই তাঁর বাড়িতে আসতেন।[৪] এইভাবে ঘরে-বাইরে পজিটিভিজমের সংস্পর্শে সতীশচন্দ্রের বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত হয়। সতীশচন্দ্রের জীবন ও যৌবন বিশ্লেষণে পজিটিভিজিমের দান প্রত্যক্ষ ও প্রোজ্জ্বল।[৫]

(২) G.P. Pillai : *Representative Indians* (London, 1897, p. 34).

(৩) 'আর্য্যাবর্ত' পত্রিকার আষাঢ়, ১৩১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত বিপিন বিহারী গুপ্তের রচনা দ্রষ্টব্য।

(৪) মতিলাল গাঙ্গুলীর অপ্রকাশিত "স্মৃতি-কথা" থেকে গৃহীত।

(৫) এই প্রসঙ্গে হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালী চিন্তায় অগাস্ত কঁৎ" (আনন্দবাজার পত্রিকা, দোলসংখ্যা, ১৩৬৪) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

।। ৩।।

সতীশচন্দ্রের বাল্যজীবন ভবানীপুরস্থ সাউথ সাবারবন স্কুলের সঙ্গে সুজড়িত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন (১৮৭৫-৭৯)। তাঁদের এই বাল্যবন্ধুত্ব আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৭৯ সনে উভয়েই উক্ত বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ্-এ ক্লাসে ভর্তি হন। নরেন্দ্রনাথ দত্তও (ভাবী স্বামী বিবেকানন্দ) উক্ত কলেজে কিছুদিন তাঁদের সহপাঠী ছিলেন। পরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শরীর বিশেষ খারাপ হলে তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ্ ইন্‌স্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) ট্রান্সফার নেন ও উক্ত কলেজ থেকে ১৮৮১ সনে এফ-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। ঐ কলেজে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নরেন্দ্রনাথের এক শ্রেণী উঁচুতে পড়তেন।[৬] প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা ভবিষ্যতে আরও দৃঢ়তর হয়। নরেন্দ্রনাথের বন্ধু হিসাবে সতীশচন্দ্রও ছাত্রাবস্থাতেই ব্রজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৪ সনে সতীশচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ, তে তিনি বি, কোর্স (বর্তমানকালের বি,এস, সি-কোর্সের অনেকটা অনুরূপ কোর্স) নিয়েছিলেন। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে "অ্যানাটমি" ছিল অন্যতম। শারীরিক অসুস্থতাবশত তাঁর এম, এ, পরীক্ষা দিতে এক বৎসর বিলম্ব হয়। ১৮৮৬ সনে তিনি ইংরেজীতে এম, এ, পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন তিনি যে সকল শিক্ষকের নিকট সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক টমাস বুথ ও প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ চার্লস্ টনির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বি, এ, পাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি দিয়ে সতীশচন্দ্রকে বিলাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পিতার অনিচ্ছায় তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

।। ৪।।

সতীশচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় বাংলা দেশের উপর দিয়ে নানা চিন্তা-তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে।[৭] এই ভাঙা-গড়ার এক বিশেষ লক্ষণ আমরা দেখতে পাই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৮) ও নানারূপ সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায়। দ্বিতীয় লক্ষণীয় চিন্তার ধারা আমরা দেখতে পাই সাহিত্য ক্ষেত্রে —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক। তৃতীয় ধারা হলো জাতীয় ভাবের স্ফুরণ

(৬) B. N. Datta *Swami Vivekananda* (Calcutta, 1954, p. 153).

(৭) হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় রচিত *The Growth of Nationalism in India* (1957) বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য।

ও বিকাশ। নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার আবহাওয়ায় (১৮৬৭-৮০) জাতীয় ভাবের উন্মেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয় সংগীত রচনা, জাতীয় নাট্যাভিনয় সেই নবচেতনার মূলে বারি সিঞ্চন করে। জাতীয় ভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক চেতনাও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হতে থাকে। ১৮৭৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় "স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েসন" ও পর বৎসর "ভারত সভা"— যার প্রাণস্বরূপ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থ লক্ষণীয় চিন্তাধারা হলো নব্য হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন — যার মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ব্রাহ্ম সমাজের উগ্র ও অতিরিক্ত মাত্রায় পাশ্চাত্য-ঘেঁষা সমাজ দর্শন গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক অথচ আবার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গতানুগতিক পথও মাড়াতে প্রস্তুত নয় — এমন লোক গত শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে বাংলা দেশে ছিল অগণিত। রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আবেদন ছিল মূলত এই ধরণের লোকের কাছে। তৎকালে যে সকল শিক্ষিত যুবক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়েছিলেন, যেমন নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ) ইত্যাদি, — তাঁরা কেহই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন উদার মতাবলম্বী নবোত্থিত ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুগামিগণকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করলে নেহাৎ ভুল করা হবে। রামকৃষ্ণের সমাজ-দর্শনে মানুষের ব্যক্তিত্বের মহিমা যেভাবে উচ্চারিত হয়েছে, তার তুলনা ধর্মের ইতিহাসে বিরল। "যত মত, তত পথ" দর্শনে রামকৃষ্ণ ধর্মক্ষেত্রে সজ্ঞান বহুত্বনিষ্ঠা প্রচার করেছেন, আর ঘোষণা করেছেন মানুষের ব্যক্তিত্বের জয়গান।[৮] সতীশচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবন বিশ্লেষণে এই সকল রকমারি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত উল্লেখযোগ্য।

।। ৫ ।।

১৮৮৩ সনের দুইটি ঘটনা সতীশচন্দ্রের জীবনে স্মরণীয়। এর একটি হলো ঐ বৎসরে সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ছাত্র আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। আর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রদত্ত হিন্দু ষড়দর্শন বিষয়ক বক্তৃতামালা শ্রবণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরহিত্যে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে হিন্দু ষড়দর্শন নিয়ে পণ্ডিত শশধর যে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন, তা তৎকালীন যুবসমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।[৯] সতীশচন্দ্র নিয়মিত ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করতে যেতেন ও পরে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বন্ধুর সঙ্গে

(৮) পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট "ঊনবিংশ শতকে বাংলার সমন্বয় সাধনা" প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে।

(৯) *Contemporary Indian Philosophy* গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৯৩৬) সন্নিবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দের আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য।

নানারূপ আলোচনা করতেন। সতীশচন্দ্র প্রথম জীবনে পজিটিভিষ্ট অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন ও মানবসেবার আদর্শকেই জীবনের পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৩-৮৪ সনে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে আলোচনাদি হ'লেও তখনও সতীশচন্দ্রের জীবনে পজিটিভিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। আর বোধ করি এই কারণেই তাঁর সে সময় রামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণের কোন ব্যাকুলতা ছিল না। তবে ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে সতীশচন্দ্রের মানসে যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে তাও এই প্রসঙ্গে আবার লক্ষণীয়। ১৮৮৫-৮৬ সনে এই পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী মতিলাল গাঙ্গুলী তাঁর অপ্রকাশিত "স্মৃতি-কথায়" লিখেছেন ঃ "সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহাদের সহিত সেজমামা (সতীশচন্দ্র) দেখা করিতেন এবং ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন।..... পরমহংসদেবের গলায় যখন ক্যান্‌সার হয় এবং তিনি বাগবাজারে শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসুর বাটিতে ছিলেন, তখন একদিন পরমহংসদেব কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্য সেজমামা ঐ বাটিতে গিয়াছিলেন এবং আমিও সঙ্গে গিয়াছিলাম আমার মনে হয়। ইহার অল্পদিন পরে পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন। অনেকদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর পরমহংসদেবের তিরোভাব উৎসব দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে সেজমামা গিয়াছিলেন। আমিও প্রত্যেক বার তাঁহার সহিত যাইতাম। পরমহংসদেবের অনেক শিষ্যের সহিত সেজমামার বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে জানা ছিল।"

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে পরমহংসদেব কেমন আছেন তা জানবার জন্যই সতীশচন্দ্র বাগবাজারের বাটি পর্যন্ত গিয়েছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের চাক্ষুষ দর্শন লাভ করলেন কিনা এ বিষয়ে মতিবাবু নীরব বা অস্পষ্ট। সতীশচন্দ্রের ছাত্র ও সেবক কৃষ্ণদাস (যিনি এক সময় মহাত্মা গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ও যিনি 'Seven Months with Mahatma Gandhi' পুস্তক লেখেন) বলেন যে, সতীশবাবু রামকৃষ্ণদেবকে কখনো দেখেননি এবং এজন্য পরে সতীশবাবু বহুবার কৃষ্ণদাস প্রমুখ প্রিয় ছাত্রের নিকট এই মর্মে দুঃখ প্রকাশও করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে অনুসন্ধানের ফলে এবিষয়ে আমাদের ধারনাও অনুরূপ। তবে রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যবর্গের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই সতীশচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তা সুবিদিত।

পরমহংসদেবের দেহাবসানের পর ১৮৮৬ সনের শেষাশেষি তাঁর তরুণ শিষ্যগণ বরাহনগরে মঠ স্থাপন করলে সতীশচন্দ্র মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন ও ধর্ম-বিষয়ে আলোচনাদি করতেন। বরাহনগর মঠের পর আলামবাজারে মঠ স্থাপিত হয় ১৮৯১ সনের শেষভাগে। আলামবাজার মঠেও সতীশচন্দ্রের গমনাগমন ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা ' মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "১৮৯১ সনে ইনি (সতীশচন্দ্র) হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন এবং শনিবার ও রবিবার এমনকি অন্য দিনেও বিশেষ কার্য না থাকিলে আদালতের কাপড় পরিয়াই অর্থাৎ চোগা চাপকান পরিয়াই আলামবাজারের মঠে চলিয়া আসিতেন। প্রায় দুই বৎসর তিনি সর্বদাই আলামবাজারের মঠে যাতায়াত করিতেন।..... কয়েক বৎসর পর তিনি 'Dawn' নামক মাসিক পত্র বাহির করিলেন এবং তদবধি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সহিত আর বিশেষ কিছু সংশ্রব রাখিতেন না।" [১০]

॥ ৬ ॥

এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর (১৮৮৬) সতীশচন্দ্র অল্প কিছুদিন মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে ঐ চাকুরীতে নিয়োগপত্র দেন (১৮৮৭)। এই সময় সতীশচন্দ্র শশীভূষণ নামে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতেন। অতঃপর বাল্যবন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আমন্ত্রণে তিনি বহরমপুর কলেজে (পরবর্তী কৃষ্ণনাথ কলেজে) ইতিহাস ও অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। তখন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। অল্প কয়েক মাস থাকার পরই তিনি পিতার একান্ত ইচ্ছায় ও পিতৃবন্ধু স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের নির্দেশে ওকালতি পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় চলে আসেন (১৮৮৮ সনের প্রথম দিকে)। এই সময় তিনি মাতাপিতার সঙ্গে ভবানীপুরস্থ বাটিতে বাস করতেন। ১৮৮৭ সনের কাছাকাছি তাঁর পিতা ২৬নং পদ্মপুকুর রোডে ভাড়াটিয়া বাটিতে বাস করতেন; কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই উহার সন্নিকটে জায়গা কিনে তিনি নিজ বাটি তৈরীর পর সেখানে চলে যান। এই নূতন বাড়ীর ঠিকানা ছিল ৪৯নং চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা। ওকালতি পড়ার সময় (১৮৮৮-৯০) সতীশচন্দ্র আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্যার রমেশচন্দ্রের কাছে মাঝে মাঝে বুঝে নিতেন। তিনি কালীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের নিকট তিন বছর শিক্ষানবীশি করবার পর জজদের নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৫০০ টাকা জমা দিয়ে হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৯০ সনে তিনি বি, এল, ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। মতিলাল গাঙ্গুলী লিখেছেন যে, ওকালতি পরীক্ষার পর সতীশচন্দ্র একদিন আলিপুর চিড়িয়াখানায় বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়িত করেন। ওখানকার সুপারিণ্টেনডেন্ট তাঁর সেজমামার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। উক্ত ভোজে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও উপস্থিত ছিলেন।

এর পর প্রায় তিন বছর সতীশচন্দ্র হাইকোর্টে ওকালতি করেন (১৮৯০-৯২)।

' (১০) মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী", দ্বিতীয় ভাগ (১৯২১, পৃঃ ৪৭-৪৯) দ্রষ্টব্য।

এই তরুণ উকিলের কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে তৎকালীন হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকিল রাসবিহারী ঘোষ বিশেষ প্রীত হন এবং নিজ বাটিতে পুত্রতুল্য সতীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। আইন ব্যবসায় তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও আর একজন ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ মিত্র (যিনি পরে পাবলিক প্রসিকিউটার হয়েছিলেন)। আইন ব্যবসায় সতীশচন্দ্র মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু এমন সময় একদা একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়ায় তিনি হঠাৎ আইন-ব্যবসা চিরতরে বর্জন করেন। এ বিষয়ে নানা মহল থেকে নানারূপ গল্প শুনেছি। তাঁর ভাগিনেয় ঁমতিলাল গাঙ্গুলী লিখেছেন যে, একজন খুনে আসামীকে সতীশচন্দ্র আপিলে খালাস করেন। পরে অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারলেন যে সেই ব্যক্তি বাস্তবিকই দোষী ছিল। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। যে ব্যবসায় এরূপ দোষীকেও নির্দোষ বলে দেখানো যায় ও যে ব্যবসায় পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখা কঠিন, সেই ব্যবসায় অর্থোপার্জনে কোনক্রমেই নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন হয় না,— এইভাবে গভীর চিন্তার পর তিনি ওকালতি বৃত্তি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করেন (১৮৯২) ও শিক্ষকতার জীবনই আবার পূর্ণোদ্যমে গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সীমারেখা টানা চলে।

॥ ৭ ॥

আচার্য সতীশচন্দ্রের জীবনেতিহাসে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮৯৩ সন থেকে। এই পর্বের মেয়াদ চলেছিল প্রায় বিশ বছর ধরে ১৯১৩ সন পর্যন্ত। এই যুগটা তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা কর্মবহুল ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ওকালতি বর্জনের পর সতীশচন্দ্র শিক্ষকতার আদর্শই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার মধ্যেই তিনি সন্ধান পান তাঁর আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া। এই সময় কলিকাতার বিত্তশালী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের পরিবারে তিনি গৃহশিক্ষকতা করতে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শী ঁমতিলাল গাঙ্গুলী লিখেছেন : "কোন ছাত্রকে তাহার বাটিতে গিয়া তিনি পড়াইতেন, কেহ তাঁহার বাসায় আসিয়া পড়িয়া যাইত এবং কাহাকেও কাহাকেও নিজের বাসায় রাখিয়া সেখানে তাহাদের পড়াইতেন।" শিক্ষক হিসাবে সতীশবাবুর সুনাম এমনভাবে ছড়িয়েছিল যে তৎকালে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেকেই বেশি বেতনে সতীশবাবুর কাছে নিজ পুত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকতেন। এর একটা কারণ হলো এই যে, ইতিপূর্বেই তাঁর হাতে কয়েকজন বিশেষ কৃতী ছাত্র শিক্ষা লাভ করে যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত

হন। সতীশবাবু ওকালতি পড়বার উদ্দেশ্যে বহরমপুর থেকে কলিকাতায় আসার পর তাঁর ভাগ্নে মতিলাল গাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের বিদ্যাশিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন (১৮৮৮)। এই সময় তিনি আরও কয়েকজন ছাত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মতিলালবাবু সেজমামার (সতীশচন্দ্রের) কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "তাঁহার সহিত আমার জীবন অনেক রকমে জড়িত এবং তাঁহার প্রভাব আমার উপর অতিরিক্তভাবে পড়িয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা তিনি যাহা আমাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্র ও জীবন আমাকে যেরূপভাবে প্রভাবিত করিয়াছে অপর কোন লোকের সঙ্গ সেরূপ করে নাই। দাদামহাশয়, দিদিমা ও মাতার শিক্ষা আমার বাল্যে ও যৌবনে পর্যবসিত ছিল। কিন্তু সেজমামার সঙ্গ আমার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঘটিয়াছে, এবং তাহা অতি ঘনিষ্ঠভাবেই ঘটিয়াছে। অতএব আমার সমস্ত জীবনের প্রত্যেক পদে পদেই সেজমামার প্রভাব কার্য করিয়াছে।" সতীশবাবুর প্রথম দিককার বিশেষ কৃতী ছাত্রদের মধ্যে প্রথমেই কিরণ চন্দ্র দে'র নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। কিরণ দে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন্ থেকে ১৮৮৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন ও যথাসময়ে এফ, এ, পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান দখল করেন। বি, এ, পড়াকালীন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৯০ সনে ইংরেজী, অঙ্ক ও পদার্থ-বিদ্যায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাশ করেন ও শেষোক্ত দুই বিষয়ে আবার প্রথম হন।[১১] কিরণ দে বি, এ, পাশ করলে সতীশচন্দ্র তাঁকে বন্দীপুর গ্রামের জমিদার নীলমণি মিত্র মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করেন ও এইভাবে তাঁর বিলাত গমনের উপযুক্ত অর্থেরও সংস্থান করে দেন। ১৮৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কিরণচন্দ্র বিলাতে রওনা হন। সেখানে তিনি দু'বছর অধ্যয়ন করেন ও ১৮৯২ সনের আই, সি, এস্ পরীক্ষায় ঊনবিংশ স্থান লাভ করেন। ঐ বৎসরের শেষাশেষি তিনি বাংলায় ফিরে এসে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন ও ভবিষ্যতে চট্টগ্রামে ডিভিশন্যাল্ কমিশনারের পদে উন্নীত হন।

কিরণ দে-র সহপাঠী জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ীও সতীশচন্দ্রের আর একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র। তিনি পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণামূলক অনেকগুলি রচনা সতীশচন্দ্র সম্পাদিত 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

ওকালতি-জীবন শুরু করবার পরেও অবসর সময়ে (১৮৯০-৯২) সতীশচন্দ্র

---

(১১) "দ্য ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ম্যাগাজিন," প্রথম খণ্ড, মার্চ, ১৮৯৪, পৃঃ ৪০ দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও ছাত্রকে পড়াতেন। এই সময় তাঁর হাতে অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন গঠিত হয়। ১৮৯০-৯১ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পড়াকালীন তিনি সতীশবাবুর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বি, এ, অনার্স পরীক্ষায় ইংরেজী ও ইতিহাসে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন ও তৎপর ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিস্‌টোরিকাল্ ট্রাইপোসের' ছাত্র হিসাবে গমন করেন। বিলাতে থাকাকালীন তিনি আই, সি, এস্, পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে থাকেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান দখল করেন ও ইংরেজীতে প্রায় শতকরা ৮৫ নম্বর পান। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি যুক্তপ্রদেশে গভর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী হন, পরে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের বাণিজ্য সদস্যের পদ লাভ করেন ও আরও পরে বিলাতে হাই কমিশনারের পদে উন্নীত হন। তাঁর ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ সতীশচন্দ্র 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশও করেছিলেন। অতুলচন্দ্র গত চল্লিশের দশকের গোড়ায় কিছুদিনের জন্য ভারতে আগমন করলে আচার্য সতীশচন্দ্রের সঙ্গে কাশীতে দেখা করেন ও তাঁর গুরুর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর বিলাতে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি সতীশবাবুর কাছে মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ পত্রালাপ চালাতেন। এই তথ্যটি সতীশচন্দ্রের স্বদেশীযুগের ছাত্র সতীশচন্দ্র গুহ ও কৃষ্ণদাস সিংহ রায়ের মুখে অনেকবারই শুনেছি।[১২]

সতীশচন্দ্র এই সকল ছাত্রের জীবন ও চরিত্র গঠন করবার জন্য কি কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, তা একালের অনেকেই অবগত নন। সতীশচন্দ্র তাঁর ছাত্রদিগকে শুধু বিদ্যাশিক্ষাই দিতেন না — তাঁদের ধর্ম-শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত বেশি কার্যকর। ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ছাড়া শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের জীবন সুষ্ঠুভাবে ও পরিপূর্ণভাবে গঠন করা কখনো সম্ভব নয়। তাই সতীশচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের যথাসম্ভব কাছে রেখে শিক্ষা দিতেন ও ছাত্রদের প্রায়ই বাসায় নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। অবসর সময়ে ছাত্রদের নিয়ে মাঝে-মাঝে কলিকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চলে বা অন্যত্র বেড়াতেও যেতেন। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, ১৮৯১ সনে যখন অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী প্রেসিডেন্সি কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন সতীশবাবু অতুলচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে রাধাকুমুদ মুখার্জীর পৈতৃক বাসভূমি আমদপুর গ্রামে (বর্তমান ইষ্টার্ণ

---

(১২) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে প্রকাশিত লেখকদের *The Origins of the National Education Movement* (১৯৫৭) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সতীশচন্দ্রের জীবনকথা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

রেলওয়ের মেমারি ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত গ্রামে) গিয়েছিলেন দুর্গাপূজা দেখবার জন্য। তখন রাধাকুমুদবাবুর বয়স মাত্র সাত বৎসর। ঐ স্থানেই সতীশচন্দ্রকে তিনি প্রথম দর্শন করেন ও তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

ওকালতি ছাড়ার পর শিক্ষকতাই সতীশচন্দ্রের জীবনে প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় তিনি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের পুত্রদের ও আলিপুরের উকিল আশু বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্রদের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। একালের প্রখ্যাত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সতীশবাবুর হাতেগড়া ছাত্র।

।। ৮।।

এই সময়কার সতীশচন্দ্রের জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা হলো প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সান্নিধ্যলাভ। বাল্যে ও প্রথম যৌবনে সতীশচন্দ্র ভগবৎ-বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু শীঘ্রই তাঁর অন্তরলোকের পরিবর্তন হতে থাকে। কলেজে পড়াকালীন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ বন্ধুর মুখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুণগান শুনলেও দীক্ষা-গ্রহণের কোন ব্যাকুলতা তখনও তাঁর মনে জাগ্রত হয়নি। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হবার পর একদিন হঠাৎ তিনি যেন ভিতর থেকে শুনতে পান—"ভগবান আছেন।" নিজের মনের অবস্থা অন্তরঙ্গ বন্ধু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ('রামকৃষ্ণ-কথামৃত' লেখককে) খুলে বলতেই মহেন্দ্রনাথ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে (উত্তর কলিকাতায়) শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে উপস্থিত হন। গোস্বামীকে দেখামাত্র সতীশচন্দ্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন ও সন্ধ্যার পর কীর্তনাদি অনেকক্ষণ শ্রবণ করে বেশি রাতে ভবানীপুরের বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসরকাল গত হয়, কিন্তু সতীশচন্দ্র আর দ্বিতীয়বার গোঁসাইয়ের দর্শনলাভে অগ্রসর হননি।

১৮৯৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস। একদিন রাত্রে প্রায় এগারোটার সময় সতীশচন্দ্র বিছানায় শুতে চলেছেন। এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাত্মা বিজয় গোস্বামীর কাছ থেকে এক বাণী নিয়ে সতীশচন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি সতীশচন্দ্রকে শুধু বলেন যে, গোঁসাই বলেছেন আগামী কাল সকাল ১০ ঘটিকায় সতীশচন্দ্রের দীক্ষা হবে ও তদনুসারে তাঁকে সকালে তৈরী হয়ে থাকতে নির্দেশ দেন। পরদিন যথাসময়ে মনোরঞ্জনবাবু সতীশবাবুকে নিতে আসবেন একথাও বলে যান। মনোরঞ্জনবাবুর এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সতীশচন্দ্র নিতান্ত আশ্চর্যান্বিত হন ও বহু রাত পর্যন্ত তন্দ্রাহীন অবস্থায় চিন্তা করতে থাকেন। পরদিন সকালে যথাসময়ে মনোরঞ্জনবাবু এসে উপস্থিত।

ঐ দিন ১০টার সময় সতীশবাবু গোস্বামীর কাছে দীক্ষালাভ করেন। দীক্ষালাভের দিনটি ছিল ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। [১৩] দীক্ষার ঘটনাটি সতীশচন্দ্র নিজেই এক সময় ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রায় বাহাদুর পাণ্ড্ বইজ্‌নাথ লিখিত এক রচনায় সতীশবাবুর দীক্ষার কাহিনীটি তাঁর নিজের ভাষায় হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত রচনাটি 'দ্য থিয়োজফিষ্ট' পত্রিকায় জানুয়ারি, ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত হয়। দীক্ষার সময় সতীশবাবুর মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার এক মনোজ্ঞ বিবরণ উক্ত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে।

॥ ৯ ॥

গোঁসাইয়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণের ঘটনাটি সতীশচন্দ্রের সমস্ত জীবনের এক যুগান্তকারী ঘটনা। সতীশচন্দ্র এরপর থেকে হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক সাধনার একনিষ্ঠ উপাসক ও অনুগামী হয়ে পড়েন। যে সতীশচন্দ্র একদিন ভগবানের অস্তিত্বে নিদারুণ সন্দিহান ছিলেন, তিনিই এখন সর্বতোভাবে ভগবৎবিশ্বাসী ও গুরুর উপর নির্ভরশীল। মানসলোকের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সেই পরিবর্তনের সুর বাইরের আচরণেও স্পষ্ট হয়ে তাঁর জীবনে দেখা দেয়। দীক্ষার পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র স্বয়ং লিখেছেন ঃ "তিনি (অর্থাৎ গুরুদেব) যে নাম আমাকে 1893 Sept. দীক্ষার সময় দিয়াছিলেন তাহা আমি প্রথম প্রথম দশ ঘন্টা করিয়া প্রত্যহ করিতাম। কিন্তু 1897-98 সনে (সনটা ঠিক মনে পড়িতেছে না) তিনি আমাকে বলিলেন যে আমার প্রারব্ধ কর্মক্ষয় আমাকেই করিতে হইবে। আর নাম জপ আমার হইয়া তিনি করিবেন৷ আমাকে করিতে হইবে না। বলিলেন যে আমার প্রারব্ধ কর্মভোগটা তিনি করিতে পারিবেন না। উহা আমাকেই করিতে হইবে। আর নাম করিবার দায়িত্ব যাহা আমাকে দিয়াছিলেন দীক্ষার সময়, তাহা তিনি আমার হাত হইতে লইয়া নিজেই লইলেন। আমি অনেক তর্ক করিলাম। কারণ নাম করিতে আমি ভিতরে আনন্দ পাইতাম। সেই আনন্দের লোভে বোধ হয় ১০ ঘন্টা করিয়া নাম করিতে পারিতাম। তখন খানিকটা রাজী হইয়া আমি প্রাতে অর্ধঘন্টা সন্ধ্যাতে অর্ধঘন্টা নাম করিতে পারি বলিলেন। তাহার দুইমাস বা একমাস পরে ঠিক মনে নাই, প্রাতে ৫ মিনিট সন্ধ্যায় ৫ মিনিট করিব এই নিয়ম করিয়া দিলেন। পরিশেষে একমাস পরে আমি যখন ৫ মিনিট হইতে অর্ধঘন্টা হয় এইরূপ আবেদন করিলাম তখন তিনি বলিলেন যে আমাকে আর নাম করিতে হইবে না।

(১৩) কলিকাতাস্থিত হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে (ভাগ্নেকে) সতীশচন্দ্র কাশী থেকে ৩০শে মে, ১৯৪০ সনে যে পত্র লেখেন, তাতে ঐ তারিখটি দেওয়া আছে। সতীশচন্দ্রের দীক্ষাকাহিনী আমাদের ইংরেজী গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমার হয়ে তিনিই করিবেন। কিন্তু আমার প্রারব্ধ কর্মভোগ আমাকেই করিতে হইবে, তিনি করিতে পারিবেন না। ইহাও স্পষ্ট বলিয়া দিলেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম যে "দীক্ষার সময় আপনিইত আমাকে নাম করিতে বলিয়াছিলেন।' উত্তরে বলিলেন — 'এখনও ত আমিই বলিতেছি যে উহা করিতে হইবে না, কেবল প্রারব্ধ কর্মভোগ করিয়া যাও'।[১৪]

দীক্ষাগ্রহণের পর সতীশচন্দ্র বিবেকানন্দের পথ অনুসরণ করে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বনের সংকল্প গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর গুরুদেব তাঁকে সে পথে যেতে বারণ করেন এবং দেশের শিক্ষা-বিস্তার ও ছাত্রগঠনের কাজে তাঁকে মনোনিবেশ করতে আদেশ দেন। সতীশচন্দ্র সে আদেশ সানন্দে শিরোধার্য করেন ও সমস্ত জীবন শিক্ষাব্রতকেই জীবনের পরম ধর্ম হিসাবে বরণ করেন।

দীক্ষার পর সতীশচন্দ্র প্রায় পাঁচ বছর ভবানীপুরস্থ সাউথ সাবারবন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এই সময় তিনি "*A Guide to Rowe's Hints, Bain's Grammar Etc,*" নামে প্রশ্নোত্তরের আকারে প্রবেশিকা ছাত্রদের উপযুক্ত একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক লেখেন। এর প্রথম তিন সংস্করণ ৫৮ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট থেকে এস, সি, আড্ডি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ছাত্রসমাজে এই বইয়ের চাহিদা এত বেড়েছিল যে ১৯০৪ সনের মধ্যেই এর সপ্তম সংস্করণ বের হয়। চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৭ সনে ছাপা হয় ও সেইসময় এর প্রকাশক ছিলেন ৬৪ নং অখিল মিস্ত্রী লেনের কেদারনাথ বসু। এই সময় পর্যন্তও এই বইয়ের সর্বস্বত্ব সতীশবাবুর ছিল এবং ঐ চতুর্থ সংস্করণ থেকে তিনি প্রায় ৬০০০্ টাকা পেয়েছিলেন। ১৮৯৯ সনের মে মাসে ঐ বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ বের করবার সময় সতীশচন্দ্র ঐ বইয়ের সর্বস্বত্ব এক হাজার টাকার বিনিময়ে কেদারনাথ বসুকে বিক্রি করে দেন।

সাউথ সাবারবন স্কুলে শিক্ষকতা করা কালে (১৮৯৩-১৮৯৭) সতীশচন্দ্র অ্যাংলো-বেদিক স্কুল নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। অল্প কিছুদিন চালাবার পর তিনি তা বন্ধ করে দেন।

সাউথ সাবারবন স্কুলে চাকুরী করে সতীশচন্দ্র যে অর্থ পেতেন, কথিত আছে তা তিনি প্রথমে গুরুভ্রাতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পরিবারকে মাসিক দান করতেন। পরে গোঁসাইয়ের নির্দেশে ঐ অর্থ নিজ মাতাকে দিতেন। কিন্তু সতীশবাবু বেশি দিন অর্থোপার্জন করতে পারেননি। কারণ ১৮৯৭ সনে তাঁর গুরুদেব তাঁকে 'আকাশবৃত্তি' ব্রত পালন করবার আদেশ দেন। সতীশচন্দ্র ১৯৪০ সনের ৩০শে

(১৪) ৩০শে মে, ১৯৪০ সনে কাশী থেকে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত সতীশচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রে এই সকল কথা বর্ণিত আছে।

যে তাঁর ভাগ্নে হারাধনকে এক চিঠিতে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই পত্রে তিনি লিখেছেন, "তিনি (অর্থাৎ গুরুদেব) আমাকে আকাশবৃত্তি দিয়া গেছেন ১৮৯৭ সনে। আকাশবৃত্তি মানে নিজে কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারিবে না, কাহারও নিকট কিছু কর্জ করিতে পারিবে না, কাহারও নিকট অভাব উপস্থিত হইলে জানাইতে পারিবে না, কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিয়া লইতে পারিবে না, অথচ ভদ্রলোকের মত দোতলা বাটীতে চাকর-বাকর রাখিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। আমার উপর এইপ্রকার আকাশবৃত্তি ব্রত দিয়া গেছেন এবং ১৮৯৮ সনে যখন তিনি পুরীতে যাইবার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান, তখন তিনি পুনরায় আমাকে ঐ সব কথা নিভৃতে বলিয়া যান। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে আমার অবস্থা কিরূপ। আমি যেন দড়ি ধরিয়া আকাশে ঝুলিতেছি — I am suspended in mid-air, দড়িটা তিনি ধরিয়া আছেন সত্য। কিন্তু সর্বদাই ভয় পাছে দড়ি ছেড়ে পড়িয়া যাই। কারণ নিজের শক্তি নাই যে জোর করিয়া দড়ি ধরিয়া থাকি। সে অবস্থা আমার নয়। কাজেই সর্বদাই ভয়ে ভয়ে জীবন কাটাইতে হয়। তিনি কখন কি করেন, কখন দড়ি ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাই। সর্বদাই ভয়। সর্বদাই এরূপ ভয় থাকাতে আমার দৃষ্টি সর্বদাই তাঁহার প্রতি — তাঁহার কৃপার প্রতি, তাঁহার দয়ার প্রতি। এইভাবে জীবন কাটাইতে হইতেছে। ।।।।. ।।।। এতদিন এই আকাশবৃত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছি বটে কিন্তু নিজের কোন শক্তি নাই! নিজের যদি শক্তি থাকিত তবে এত ভয় হইত না । আমি তাঁহাকে অহরহঃ ভয় করিয়া জীবন কাটাইতেছি বলিয়া বোধহয় তিনি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন এবং একেলা অসহায় হইয়াও কোন রকমে দাঁড়াইয়া আছি। ..... আমি নাম না করিয়াও আমার চিত্তকে বাধ্য হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে লাগাইয়া রাখিতে হয়।" সতীশবাবুর যে কয়খানা পত্র আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি তার ভেতর ঐ একই সুর বারেবারে উচ্চারিত হয়েছে। দীক্ষার পর থেকে তিনি এমনভাবে গুরুর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন ও ভগবৎবিশ্বাস তাঁর জীবনে এত জ্বলন্ত হয়ে ওঠে যে ঐ ধর্মবিশ্বাসই তাঁর সকল সামাজিক কাজকর্মকে প্রদীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে রাখে। শিশুসুলভ সরলতা, দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, সুতীব্র স্বদেশপ্রেম আর ঐকান্তিক গুরুভক্তি তাঁর জীবনকে এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করে তোলে। [১৪ক]

(১৪ক) ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় যখন বেনারসে গবেষণা-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন (১৯৪৪-৪৮), তখন আচার্য সতীশচন্দ্রের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি তাঁর "মহাজন সংবাদ"; গ্রন্থে (১৯৯৯) ঐ মহাপুরুষের একটি অসাধারণ চরিত্র-চিত্রণ এঁকেছেন। সতীশবাবু গোবিন্দবাবুকে বলেছিলেন "লোকে সন্ন্যাসী হয় কেন জানেন? .... বেশির ভাগ মানুষই সন্ন্যাস নেয় নিজের সূক্ষ্ম অহমিকাকে প্রকাশের জন্য। আমি সকলের থেকে স্বতন্ত্র, আমি সাধারণ সংসারী লোক নই, এইটে জানান দেবার জন্য" (পৃঃ ৬)। গুরুচরণে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ও আত্মবিলোপের যে দৃষ্টান্ত সতীশচন্দ্র নিজের জীবনে স্থাপন করেছিলেন ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে তার নজির বাস্তবিকই বিরল।

গৃহীর মতো আজীবন থেকেও সারাজীবন তিনি সন্ন্যাসীর মতো কাটিয়েছেন ও বহুজনের কল্যাণের কাজে নিজেকে নীরবে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছিলেন। এমন আত্মভোলা, নামযশ-পরাঙ্মুখ সমাজ-সেবক ও দেশপ্রেমিক কালেভদ্রে মানুষের মধ্যে দেখা যায়। বাহ্য-আড়ম্বর অস্বীকার করে লোকভয়ের উর্দ্ধে উঠে তিনি যে আদর্শের উপাসনা সারা জীবন ধরে করেছেন তা যুগে যুগে মানুষের পূজা পাবে। আধ্যাত্ম সাধনার একনিষ্ঠ উপাসক হলেও কর্মই ছিল তাঁর কাছে ধর্ম, জ্ঞানই ছিল মুক্তির সোপান। ভক্তিকে স্বীকার করতে গিয়ে তিনি জ্ঞানকে অস্বীকার করেননি, নীরব সাধনাকে মূল্য দিতে গিয়ে তিনি দেশের মঙ্গল বিস্মৃত হননি। দৃষ্টির সমগ্রতা তাঁর জীবনকে এক অনবদ্য মহিমায় মহিমান্বিত করেছিল। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী।

দ্বিতীয় অধ্যায়
'ডন' পত্রিকা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

॥ ১ ॥

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে 'ডন' পত্রিকা এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। মাত্র ষোল বছরের (১৮৯৭-১৯১৩) পরমায়ু নিয়ে এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলেও দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে ও নব নব চিন্তাধারা সঞ্চারণে 'ডন'-এর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুতীব্র স্বদেশনিষ্ঠা ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো এই জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সুষ্ঠু প্রকাশ ও পরিচালনা।[১] ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে অন্ধ স্বদেশানুরাগের মোহ থেকে মুক্ত করে সতীশচন্দ্র তাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এক উদার বিশ্বজনীন ভিত্তিতে। তাই অন্যান্য জাতির সাধনা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সমান উৎসাহে এই পত্রিকায় আলোচিত হতো। বিংশ শতকের সূচনায় বাংলার মনীষা জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজনীনতার যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসে ব্যাপৃত ছিল, তার এক বিস্ময়কর স্বাক্ষর মেলে এই পত্রিকায়।

১৮৯৭ সনের মার্চ থেকে ১৯১৩ সনের নভেম্বর পর্যন্ত 'ডন' পত্রিকা সতীশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই ষোল বছরের ভেতর কেবল সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ থেকে জুলাই, ১৯০৬ পর্যন্ত 'ডন' পত্রিকা দ্বৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হতো। এই স্বল্প-পরিসর সময়টুকু বাদ দিলে 'ডন' ছিল আগাগোড়াই ইংরেজী মাসিক পত্রিকা। ষোল বছরে 'ডন'-এর প্রকাশসংখ্যার কালানুক্রমিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) প্রথম খণ্ড (মার্চ, ১৮৯৭ — ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮)

(২) দ্বিতীয় খণ্ড (মার্চ, ১৮৯৮— ডিসেম্বর, ১৮৯৮ এবং জুন-জুলাই, ১৮৯৯। জানুয়ারি থেকে মে, ১৮৯৯ এই পাঁচ মাস পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ ছিল)।

(৩) তৃতীয় খণ্ড (আগস্ট, ১৮৯৯ — জুলাই, ১৯০০)

(১) এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা লেখকদের *The Origins of the National Education Movement* (কলিকাতা, ১৯৫৭) পুস্তকে পাওয়া যায়।

(৪) চতুর্থ খণ্ড (আগষ্ট, ১৯০০ — জুলাই, ১৯০১)
(৫) পঞ্চম খণ্ড (আগষ্ট, ১৯০১ — জুলাই, ১৯০২)
(৬) ষষ্ঠ খণ্ড (আগষ্ট, ১৯০২ — জুলাই, ১৯০৩)
(৭) সপ্তম খণ্ড (আগষ্ট, ১৯০৩ — জুলাই, ১৯০৪)

১৯০৪ এর সেপ্টেম্বর থেকে 'ডন' পত্রিকার নবপর্যায় শুরু হয়। এই পর্যায়ে পত্রিকার নতুন নাম হলো 'দ্য ডন'-এর বদলে 'দ্য ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন্' (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪—নভেম্বর, ১৯১৩)

(৮) প্রথম খণ্ড (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪— জুলাই, ১৯০৫)
(৯) দ্বিতীয় খণ্ড (সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ — জুলাই ১৯০৬)
(১০) তৃতীয় খণ্ড (সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ — আগষ্ট, ১৯০৭)
(১১) চতুর্থ খণ্ড (সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ — অক্টোবর, ১৯০৮)

নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৭ এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৮ এই চার মাস 'ডন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ছিল।

(১২) পঞ্চম খণ্ড (জানুয়ারি, ১৯০৯—ডিসেম্বর, ১৯০৯)
(১৩) ষষ্ঠ খণ্ড (জানুয়ারি, ১৯১০—ডিসেম্বর, ১৯১০)
(১৪) সপ্তম খণ্ড (জানুয়ারি, ১৯১১—ডিসেম্বর, ১৯১১)
(১৫) অষ্টম খণ্ড (জানুয়ারি, ১৯১২—ডিসেম্বর, ১৯১২)
(১৬) নবম খণ্ড (জানুয়ারি, ১৯১৩—নভেম্বর, ১৯১৩)

'ডন' পত্রিকার কার্যালয় এই ষোল বছরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ছিল ঃ

(১) ৪৪ নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা
(মার্চ, ১৮৯৭ — ডিসেম্বর, ১৮৯৮)

(২) ৩ নং পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা
(জুন,১৮৯৯ — ফেব্রুয়ারি, ১৯০২)

(৩) ৭৯ নং পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা
(মার্চ, ১৯০২ — জুলাই, ১৯০৪)

(৪) ২২ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
(সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ — জুলাই, ১৯০৬)

(৫) ১৯১/১ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
(সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ — মে, ১৯০৭)

(৬) ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
(জুন, ১৯০৭—অক্টোবর, ১৯০৯)

(৭) ১২ নং লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
(নভেম্বর, ১৯০৯ — এপ্রিল, ১৯১১)

(৮) ৮/২ নং হেস্টিংস্ স্ট্রীট, কলিকাতা
(মে, ১৯১১ — নভেম্বর, ১৯১৩)

স্বদেশী আন্দোলন বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঠিক মূল্যায়ন ও ইতিহাস রচনার পক্ষে 'ডন'-পত্রিকার এই ষোল খণ্ড এক অমূল্য সম্পদ। তৎকালীন বাংলা দেশের সরকারী কলেজগুলিতে এককালে (জুলাই, ১৯০০—জুলাই, ১৯০৪) এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে রাখবার ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য সাধারণ পাঠাগারে ও গবেষণা পরিষদেও এই পত্রিকা সংরক্ষিত হতো। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, তৎকালের বহুল প্রচারিত ও সম্বর্ধিত 'ডন' পত্রিকা একালে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এককালে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র স্বয়ং ইম্পীরিয়াল্ লাইব্রেরীতে (অধুনা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে) 'ডন'-এর সম্পূর্ণ সেট্ উপহার দিয়েছিলেন। তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান্ জন চ্যাপম্যান্ স্বাক্ষরিত প্রাপ্তি স্বীকারও সতীশচন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছিল। 'ডন'-পত্রিকার ভূতপূর্ব ম্যানেজার ও পরে 'ইণ্ডিয়ানা' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র গুহ ১০.৫.৪৮ তারিখে কাশী থেকে আমাদের এক পত্রে জানিয়েছিলেন ঃ "Chapman স্বাক্ষরিত acknowledgement আমি দেখেছি।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে কলিকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতেও মাত্র দু-চারটি সংখ্যা ছাড়া 'ডন'-এর অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর বা উপাচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেনের ঘরে ঐ পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যা ১৯৬০ সনেও রক্ষিত ছিল। সম্পূর্ণ সেট্ বর্তমানে কলিকাতার কোনো পাঠাগারে বা পরিষদে নেই — একমাত্র মনোহরপুকুর রোডে মিত্রদের বাগান বাড়ীতেই পাওয়া যায়। বহু অনুসন্ধান ও চেষ্টার ফলে বর্তমান লেখকদ্বয়ও 'ডন'-এর একটি অসম্পূর্ণ সেট্ সংগ্রহ্ করতে পেরেছে। বর্তমান লেখকদ্বয়ের চেষ্টার ফলে 'ডন' পত্রিকার ষোল খণ্ডের মাইক্রোফিল্ম নয়াদিল্লীর নেহেরু মেমোরিয়্যাল মিউজিয়ামে সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। সনটা সঠিক মনে নেই, বোধ হয় গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে । কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতঅধ্যাপক ডঃ অনিল শীল সে সময় দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই মূল্যবান কাজটি (নেহেরু মিউজিয়ামে 'ডন'-এর

মাইক্রোফিল্মের সংরক্ষণের ব্যবস্থা) সুসম্পন্ন হওয়ায় তিনি যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছিলেন।

॥ ২ ॥

১৮৯৭ সনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় একত্র হয়ে 'ডন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।[২] ঐ প্রত্রিকা প্রকাশের আদি পর্বে আরও দুইজন ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (তৎকালে বঙ্গবাসী কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক), আর একজন আলিপুর কোর্টের উকিল মন্মথনাথ পাল। অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকে মাত্র কয়েক মাস এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কারণ 'ডন' পত্রিকা স্থাপনের অল্পদিন পরেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। তদবধি ১৯১৩ সন পর্যন্ত সতীশচন্দ্রকেই 'ডন' পত্রিকার মূল দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র আমৃত্যু (১৮৯৯ সন পর্যন্ত) এই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

॥ ৩ ॥

'ডন' পত্রিকার বিবর্তনে কয়েকটি বিশিষ্ট স্তর নির্দেশ করা চলে। প্রথম স্তরে 'ডন' পত্রিকা ছিল 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র মুখপত্র (মার্চ, ১৮৯৭ — জুলাই, ১৯০৪। ১৮৯৫ সনে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' ছিল সতীশচন্দ্রের গঠনমূলক স্বদেশসেবার প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষাদানের নিমিত্ত এই টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক বা কারিগরী শিক্ষাদানেরও আদর্শ চতুষ্পাঠীর লক্ষ্যের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এই চতুষ্পাঠী ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক প্রতিষ্ঠান। গুরুর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠনের প্রয়াসই ছিল এর মূল লক্ষ্য বা নীতি। এই চতুষ্পাঠীর মুখপত্ররূপেই 'ডন'-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

কেহ কেহ লিখেছেন যে, ডন সোসাইটির মুখপত্ররূপেই 'ডন' পত্রিকার জন্ম। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সনের জুলাই

(২) অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় পরে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী স্বরূপানন্দ নামে পরিচিত হন ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা কিছুকাল সম্পাদনা করেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার (১৮৯৫) প্রথম সম্পাদক রাজম্ আয়ার (মাদ্রাজী) জুন, ১৮৯৮ সনে পরলোক গমন করলে ঐ পত্রিকা সম্পাদনের ভার স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বরূপানন্দ গ্রহণ করেন ও ১৮৯৯ সনের মার্চ থেকে ১৯০৬ এর জুন পর্যন্ত ঐ পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করেন। ২৭শে জুন, ১৯০৬ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ রচিত "স্বামী স্বরূপানন্দ" শীর্ষক আলোচনাটি (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৩) দ্রষ্টব্য।

মাসে। কিন্তু 'ডন' পত্রিকার জীবন শুরু হয় ১৮৯৭ সনের মার্চ মাসে। প্রাক্-ডন সোসাইটি যুগে (১৮৯৭-১৯০২) 'ডন' পত্রিকা ছিল 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র মুখপত্র। এমনকি, ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরও 'ডন' পত্রিকা উক্ত চতুষ্পাঠীর মুখপত্ররূপেই জুলাই, ১৯০৪ সন পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। বস্তুত, তখন পর্যন্ত ডন সোসাইটির নিজস্ব কোনো মুখপত্র ছিল না। কাজেই একথা বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে যে ডন সোসাইটির মুখপত্র হিসাবেই 'ডন' পত্রিকার জন্ম। পক্ষান্তরে, 'ডন' পত্রিকার নামানুসারেই ১৯০২ সনে সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির নাম 'ডন সোসাইটি' হয়েছিল। প্রথম কয়েক বছর (১৮৯৭-১৯০৪) ডন পত্রিকা 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই ঐ সময় পত্রিকা থেকে যে আয় হতো তার সবটুকুই চতুষ্পাঠীর কাজে, — যেমন আচার্যের বেতন প্রদানে, শাস্ত্র ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ ক্রয়ে, ছাত্রদের খাওয়া-পরার সংস্থানে, — ব্যায়ত হতো।

'ডন'-এর প্রথম পর্যায়ে যে সকল রচনা এখানে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি প্রধানত ছিল ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পাশে ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনায় আলোচনাই ছিল ঐ সকল প্রবন্ধের একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও সৃষ্টিধর্মী ভারতের যে গৌরবময় সংস্কৃতি, তার মহিমময় বাণী প্রচার ও বিশ্বদরবারে ভারতের সাংস্কৃতিক মান প্রতিষ্ঠার মহাব্রত গ্রহণ করেছিল 'ডন' পত্রিকা। জ্বলন্ত জাতীয়তার প্রেরণাই ছিল এই কর্মের পেছনে প্রধান প্রেরণা। বস্তুতঃ ঐ একই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সময় আরও দু'টি পত্রিকা—'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন'— স্বকীয় পথে অনুরূপ ব্রত পালন করে চলেছিল। ঐ উভয় পত্রিকারই মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।

ধর্ম ও দর্শন ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ও—যেমন বিজ্ঞান. ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি —'ডন'-এর প্রথম স্তরে ঠাঁই পেয়েছিল। পত্রিকার এই পর্যায়ে যে সকল মনীষী তাঁদের রচনাসম্ভারে 'ডন'-এর শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিসেস্ অ্যানি বেশান্ত্, স্বামী অভেদানন্দ, 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'-রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সিস্টার নিবেদিতা, রমাপ্রসাদ চন্দ, দুর্গাচরণ বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যক্ষ জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ি, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, যদুনাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ,

স্যার জর্জ বার্ডউড, অধ্যাপক এ. এ. ম্যাকডোন্যাল, অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল্ প্রমুখ ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর উল্লেখযোগ্য সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত ও অস্বাক্ষরিত অসংখ্য চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের নিয়মিত প্রকাশ।

১৮৯৭ সনের মার্চ মাসে 'ডন' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ। এক বৎসর গত হতে না হতেই তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে ঐ পত্রিকা মর্যাদার আসন দখল করে। ১৮৯৮ সনের ১২ই এপ্রিল তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন ঃ " 'ডন' পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে আমি এর নিয়মিত পাঠক। সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনায় এই পত্রিকায় যে বিশ্লেষণ-শক্তির প্রয়োগ দেখতে পাই, তা সাধারণত অন্যত্র দুর্লভ। এ দেশীয় সংবাদ সাহিত্যে এই পত্রিকাখানি একটি মূল্যবান অবদান।" ঐ বৎসরই ১৬ই এপ্রিল তারিখে স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'ডন' পত্রিকা প্রসঙ্গে বলেন ঃ "আমি 'ডন' পত্রিকার জনৈক গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক। এর যে বস্তু সবচেয়ে বেশি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো এর মধ্যে এত বেশি মৌলিক রচনা প্রকাশ। ভারতবর্ষের মধ্যে এ শ্রেণীর পত্রিকা সম্পূর্ণ নূতন।" ১৮৯৮ সনে 'ডন' পত্রিকা শুধু বাংলা দেশেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সুদূর ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায়ও গৌরবজনক স্বীকৃতি পেয়েছিল। ১৮৯৮ সনের ২০শে আগষ্ট বিলাতের বিখ্যাত 'লীড্‌স টাইমস্' *(Leeds Times)* সাপ্তাহিক'ডন' সম্বন্ধে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধের নাম ছিল ভারতবর্ষের উপর আমাদের প্রভাব ("Our Influence on India")। ঐ প্রবন্ধে 'ডন' পত্রিকাকে 'অতুলনীয় সৃষ্টি' ('unique production') রূপে বিশেষিতকরা হয়।

'ডন' পত্রিকার এই দ্রুত সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল পত্রিকা-সম্পাদক স্বয়ং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। জ্বলন্ত স্বদেশসেবার আদর্শ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্য তাঁর মনে স্থান পায়নি। অর্থের প্রলোভন বা নামযশের কাঙালীপনা তাঁর দেবতুল্য চরিত্রকে কখনো পঙ্কিল করেনি। 'ডন' পত্রিকার সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য তিনি অহর্নিশ যে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং 'ডন' পত্রিকার মাধ্যমে জাতির সেবায় তিনি যেভাবে নিজের ব্যক্তিগত সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করেছিলেন, আধুনিক বাংলার ইতিহাসে তা সুদুর্লভ। বাঙালীর বিজয়-নিশান 'ডন'-এর মাধ্যমে তিনি শুধু ভারতের জনপদে জনপদেই প্রতিষ্ঠিত করেননি, সাগরপারের বিলাত-আমেরিকায়ও তা প্রোথিত করেছিলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজও তা গৌরবের অক্ষরে লেখা আছে। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ব্যাখ্যাতা ছিলেন ১৮৯৭—১৯০৪-এর যুগে এই মনীষী। এখনকার দিনে যাঁরা দর্শনের চর্চা করেন, তাঁদের পক্ষেও সতীশচন্দ্রকে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে আজ যাঁরা দেশের অগ্রণী ভাবুক ও নায়ক, তাঁদেরও অন্যতম গুরুস্থানীয় এই মনীষী। যুবক ভারতকে বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল সজ্ঞান ও সুসংলগ্ন। এই বিষয়ের উপর অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত প্রশংসনীয় গবেষণা করে চলেছেন। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য এই যে, তখনকার দিনে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক গবেষণায়ও সতীশচন্দ্র ছিলেন অন্যতম পথপ্রদর্শক।[৩] তৎকালীন রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন ও যদুনাথ সরকার প্রমুখ বরেণ্য ঐতিহাসিকের নামের সঙ্গে এই চিন্তাবীরের নামও একালের ইতিহাস সাধকদের পক্ষে স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়।

॥ ৪॥

'ডন' পত্রিকার দ্বিতীয় যুগ শুরু হয় সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সন থেকে, আর এর মেয়াদ চলেছিল আগষ্ট, ১৯০৭ সন পর্যন্ত। এই যুগে 'ডন' 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র মুখপত্র থেকে 'ডন' সোসাইটি'র (জুলাই, ১৯০২ সনে প্রতিষ্ঠিত) মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়। 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হবার পরও দুই বৎসরাধিকাল পর্যন্ত সোসাইটির অফিস ও 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' পরিচালিত পত্রিকার অফিস আলাদা আলাদা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সনে 'ডন' পত্রিকা 'ডন সোসাইটি'র মুখপত্রে রূপান্তরিত হলে 'ডন সোসাইটির অফিসই (২২ নং শঙ্কর ঘোষ লেন—তৎকালীন মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশান্ বা বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের বাড়ী) পত্রিকার অফিসে পরিণত হয়। তদবধি এই পত্রিকা ২২ নং শঙ্কর ঘোষ লেন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসে 'দ্য বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হলে 'ডন সোসাইটি' ও 'ডন' পত্রিকা উভয়েরই কার্যালয় জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থল ১৯১/১ বহুবাজার স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এই শেষোক্ত ঠিকানা থেকেই নব পর্যায়ে 'ডন'-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় যুগে 'ডন' পত্রিকার কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রথম বিশেষত্ব—পত্রিকার নামকরণের পরিবর্তন। এতদিন যে পত্রিকার নাম ছিল শুধু 'দ্য ডন', নব

(৩) ১৯৫৭ সনের ৪ঠা ডিসেম্বরে লিখিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয়ক এক রচনায় আচার্য যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছিলেন : "We had one interest in common, – how to make Indian historical research fit to stand unabashed in the European world of scholarship." এই প্রসঙ্গে লেখকদের *The Origins of the National Education Movement* গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৭), ৪১৮-৪২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পর্যায়ে তার নাম হয় "দ্য ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন" বা সংক্ষেপে কেবল 'ডন ম্যাগাজিন'। 'ডন সোসাইটি'র সত্যকার মুখপত্ররূপে এই পত্রিকা ১৯০৭ সন পর্যন্ত কাজ করে চলে, যদিও পত্রিকার এই নূতন নাম তৃতীয় যুগেও (নভেম্বর, ১৯১৩ পর্যন্ত) অক্ষুণ্ণ ছিল। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো এই যে, প্রথম স্তরে যে পত্রিকা ছিল মাসিক পত্র, নব পর্যায়ে তা দ্বৈমাসিকে পরিণত হয়। দ্বৈমাসিক অবস্থায় 'ডন ম্যাগাজিন' বের হয়েছিল মাত্র দুই বৎসর—(সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ থেকে জুলাই, ১৯০৬ পর্য্যন্ত); আর তৎপরবর্তী এক বৎসর (সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ থেকে আগষ্ট, ১৯০৭ পর্যন্ত) বের হয়েছিল মাসিক পত্র হিসাবে। তৃতীয় বিশেষত্ব ছিল—নব পর্যায়ে ডন ম্যাগাজিনে 'ইণ্ডিয়ানা', 'টপিকস্ ফর্ ডিস্কাশান্' ও 'স্টুডেন্টস্ সেক্শান' নামক তিনটি স্বতন্ত্র অংশের প্রবর্তন। "দেশকে ভালবাসতে হলে দেশকে জানতে হবে" ("To love the country, one must know the country") এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই সতীশচন্দ্র 'ডন'-এর দ্বিতীয় যুগে 'ইণ্ডিয়ানা' অংশ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 'ইণ্ডিয়ানা' অংশ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নব পর্যায়ে 'ডন'-এর প্রথম সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, প্রথম ভাগ, পৃঃ২) সম্পাদক সতীশচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন ঃ "বর্তমানে ভারতবর্ষের জনগণ ও রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের জ্ঞান পরিষ্কার ও ব্যাপক নয়। বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা, তাদের সামাজিক নিয়ম-কানুন, ভাষা ও সাহিত্য, তাদের জীবিকা অর্জনের উপায়, তাদের ধর্ম, তাদের শিক্ষা, তাদের সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এক প্রকার নেই বললেই ঠিক বলা হয়। একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও যেখানে পরস্পর সম্পর্কে পরস্পরের অজ্ঞতা এমন সুবিস্তৃত, সেখানে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনো যথার্থ সম্প্রীতি বা ঐক্যের বন্ধন আশা করা নিষ্ফল। আমাদের বর্তমান-জীবনে যে বাহ্যিক ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, তা একই শাসনের অধীনে বসবাসের পরিণতি এবং তা আমাদের বেলায় আভ্যন্তরীণ বিকাশ নয়,—উপর থেকে চাপানো মাত্র। তাই এই প্রকার জীবন-প্রণালীকে শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ ঐক্যের বন্ধনে দৃঢ়ীভূত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরস্পরের প্রকৃত অভাব ও অবস্থা সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিস্তার।" এই মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই সতীশচন্দ্র 'ডন'-এর নব পর্যায়ে "ইণ্ডিয়ানা" অংশের প্রবর্তন করেছিলেন। স্বদেশের প্রতি সত্যকার মমত্ববোধ জাগ্রত করে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করার মহাব্রত গ্রহণ করেছিলেন সতীশচন্দ্র। 'ইণ্ডিয়ানা' অংশে নিয়মিতভাবে আলোচিত হতো ভারতীয় নরনারী,

শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-রীতিনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব। ভারতের অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের উপর বহু গবেষণামূলক রচনা এই অংশে প্রকাশিত হতে থাকে। সেন্সাস্ রিপোর্টে প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের শিল্প, কৃষি, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান আলোচনা এখানে দৃষ্ট হয়। এই সকল লেখালেখির কাজে প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন স্বয়ং সতীশচন্দ্র। তাঁরই নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে উক্ত বিভাগের উপযোগী প্রবন্ধগুলি রচিত হতো। প্রবন্ধ রচনার কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সতীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হারাণচন্দ্র চাকলাদার।

নব-পর্যায়ে 'ডন'-এর দ্বিতীয় অংশের নাম ছিল 'টপিকস্ ফর্ ডিস্কাশান্'। এই অংশে সাধারণত জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোক সম্পাত করে ছোট ছোট স্তবক প্রকাশিত হতো। প্রথম দিকে রাজনৈতিক বিষয় সজ্ঞানভাবেই বর্জিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯০৬ সনের নভেম্বর মাস থেকে পত্রিকার এই অংশে রাজনীতিমূলক আলোচনাও স্থান পেতে থাকে। রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতেন ডন সোসাইটির ছাত্র রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। স্বর্গত অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় আমাদের বলেছেন, অন্যান্য বিষয়ের উপর রচনাগুলি লিখতেন প্রধানত সম্পাদক নিজেই। তবে দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের রচনা থেকেও মাঝে মাঝে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দেওয়া হতো। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল পাঠকবর্গের সামনে নূতন নূতন চিন্তার ধারা উপস্থিত করা ও তাদের মনে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় কৌতূহল সৃষ্টি করা। সেই সকল বিষয়ে পাঠকবর্গের নিজ নিজ মত প্রকাশের সুযোগও দেওয়া হতো পত্রিকার মাধ্যমে। মূল কথা, দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ও পাঠকসমাজের মধ্যে আত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করার প্রয়াসে সতীশচন্দ্র বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই প্রয়াসে তিনি যে স্মরণীয় সফলতা লাভ করেছিলেন, ১৯০৪-০৭ সনের 'ডনে' তার প্রচুর স্বাক্ষর মিলবে।

দ্বিতীয় যুগে 'ডন'-এর তৃতীয় অংশের নাম 'স্টুডেন্টস্ সেকশান্'। এই অংশে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ডন সোসাইটির সভ্যদের ও 'ডন' পত্রিকার পাঠকদের রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। একমাত্র এই অংশে প্রকাশিত লেখাগুলির রচয়িতাদের নাম-ধাম লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে ভারতের সকল অঞ্চলেই এই পত্রিকা তৎকালে কি বিরাট সাড়া সৃষ্টি করেছিল। লেখকেরা নিজ নিজ গ্রাম, জেলা বা শহরের লোকজন, ভাষা, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আঞ্চলিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ

'ডন'-এর উদ্দেশ্যে পাঠাতেন। 'টপিক্স ফর্ ডিস্কাশান্'-এর উপর মন্তব্য প্রকাশ করেও এঁরা কখনও কখনও লিখতেন। শ্রেষ্ঠ লেখকদের প্রকাশিত রচনার জন্য ডন সোসাইটির তরফ থেকে পুরস্কার দেবারও ব্যবস্থা ছিল।

'স্টুডেন্টস্ সেকশানের' অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ অংশের নাম ছিল 'স্টুডেন্টস কলাম্'। এই নির্দিষ্ট অংশটি একমাত্র ছাত্ররাই ব্যবহার করতে পারতো। 'ডন'-এর একজন বিশিষ্ট পাঠক-লেখক ভানুশঙ্কর রামশঙ্কর মেটার অনুরোধক্রমে এই অংশ খোলা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রগণ নানাবিধ প্রশ্ন করে সম্পাদকের নিকট চিঠি পাঠাতো।

সম্পাদক ঐ সকল প্রশ্ন খানিকটা নিজে বাছাই করে 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। পরের সংখ্যায় আবার ঐ সকল প্রশ্নের উপর ছাত্রদের যে-সব উত্তর আসতো সেগুলি এবং সেই সঙ্গে নূতন নূতন প্রশ্নও ছাপা হতো। বস্তুত ১৯০৪-১৯০৭ সনের যুগে 'ডন' পত্রিকা ভারতীয় ছাত্রসমাজের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। ডন সোসাইটির সভ্য বা 'ডন' পত্রিকার গ্রাহক না হয়েও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এমন একটি উচ্চাঙ্গ পত্রিকাকে এমন নিজস্বভাবে ব্যবহারের সুযোগ লাভ সেকালের কেন একালের ছাত্রদের পক্ষেও একান্তই দুর্লভ। 'ডন'-এর এই 'স্টুডেন্টস কলামে' যে সকল ছাত্র নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন, তাঁদের মধ্যে পোপৎলাল গোবিন্দলাল শা (আমেদাবাদ), ভবানীচরণ মিত্র (পাটনা), রাজেন্দ্র প্রসাদ (সারন্, বিহার), কৃপাশঙ্কর প্রভাশঙ্কর আচার্য (কাথিয়াওয়াড়), এইচ্. এইচ্. মণিয়ার (কাথিয়াওয়াড়), হরি রঘুনাথ ভাগবৎ (পুণা), হরিপদ ঘোষাল (তমলুক, বাংলা), রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, কিশোরীমোহন গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা), জি. কৃষাণ পট্টি (ত্রিবান্দ্রম), বেঙ্কটস্বামী রাও (চিতুর, মাদ্রাজ), জি. কুঞ্জেন পিল্লাই (ত্রিবাঙ্কুর), ও সতীশচন্দ্র গুহ (বরিশাল) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে নজরে পড়ে।

স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, এঁদের মধ্যে অবাঙালী পাঠক ও লেখকগোষ্ঠী সংখ্যায় বেশ পুরু ছিল। তাঁদের কয়েকজনের সনির্বন্ধ অনুরোধে ও আগ্রহে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সময় 'ডন'-এ আরও একটি বিশেষত্ব প্রবর্তন করেন। পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত 'স্টুডেন্টস্ সেকশানে' যে বাংলা প্রবন্ধগুলি ছাপা হতো, সেগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই ছিল ডন সোসাইটির সভ্যদের লেখা সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতাদির সারমর্ম। বহু মূল্যবান বাংলা রচনা এই অংশে প্রকাশ করা হতো। কিন্তু এই সকল বাংলা রচনা 'ডন'-এর অবাঙালী পাঠকদের নিকটে থেকে যেতো

প্রায়ই অবোধ্য বা দুর্বোধ্য। এই সকল বাংলা রচনার প্রতিও অবাঙালী পাঠকদের আন্তরিক আগ্রহ দেখা দেয়। পোপৎলাল গোবিন্দলাল শা (যিনি পরে বহুকাল Indian P. E. N.-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন) ও রাজেন্দ্র প্রসাদ (ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট) প্রভৃতি 'ডন'-এর কয়েকজন বিশিষ্ট পাঠকের অনুরোধক্রমে [৪] সতীশচন্দ্র ১৯০৭ সনের জানুয়ারি মাস থেকে 'ডন'-এর তৃতীয় অংশে সন্নিবেশিত বাংলা প্রবন্ধগুলি 'দেবনাগরী' হরফে ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেই সময় বাংলা দেশে 'নাগরী' হরফ ব্যবহারের সপক্ষে একটি আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রধানতম পাণ্ডা ছিলেন জজ সারদাচরণ মিত্র। সারদাচরণের নেতৃত্বে ১৯০৬ সনে কলিকাতায় "একলিপি বিস্তার-পরিষদ্" নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং তাঁর সম্পাদনায় "দেবনাগর" নামক একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। সমগ্র ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ঐক্যগ্রথিত করবার উদ্দেশ্যে সকল ভারতীয় ভাষায় একই ধরণের নাগরী হরফ ব্যবহারের প্রয়োজনবোধ থেকে এই আন্দোলনের জন্ম।

'ডন'-এর বাংলা অংশে নাগরী হরফের প্রবর্তন করে সতীশচন্দ্র যুগোপযোগী কর্তব্যই পালন করেছিলেন।

॥ ৫ ॥

'ডন' পত্রিকার তৃতীয় যুগ নির্দেশ করা চলে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ থেকে নভেম্বর, ১৯১৩ পর্যন্ত। এই যুগে 'ডন' ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকাণ্ড দর্পণস্বরূপ। ইতিপূর্বেই ডন সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম দিয়ে (১৯০৬) ধীরে ধীরে এই শিক্ষা পরিষদের মধ্যেই আত্মবিসর্জন করে। এর পর থেকে ডন সোসাইটির চিন্তাধারা ও আদর্শ বৃহত্তর পটভূমিতে বহন করে চলে 'ডন' পত্রিকা। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭-১৩ সনের 'ডন' পত্রিকার সংখ্যাগুলি পাঠ করলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি সামগ্রিক রূপ চোখে পড়ে।

জানুয়ারি, ১৯০৭ সন থেকে 'ডন' পত্রিকার উপরিভাগে প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরগুলি ছাপা হতো। আর এই প্রশ্নোত্তরগুলির মধ্যেই 'ডন'-এর বাণী উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছিল।

"প্রশ্ন"

ভারতের ছাত্রসমাজ কি উপায় তাদের স্বদেশপ্রীতি বাড়াতে পারে?

(৪) 'ডন ম্যাগাজিন', নভেম্বর, ১৯০৫, তৃতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ২৪-২৬ দ্রষ্টব্য।

"উত্তর"

(ক) ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিমাপ বাড়িয়ে;

(খ) দেশের স্বার্থোপযোগী কাজগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে করবার শিক্ষা লাভ করে;

(গ) দেশবাসীর মনে দেশজ শিল্প-সম্ভার ব্যবহারের জন্য আগ্রহ সঞ্চার করে;

(ঘ) জাতীয় শিক্ষা প্রসারের কাজে সহায়তা করে।

প্রকাশ্য রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেও যে কি ভাবে ও কি পরিমাণে রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করা সম্ভব, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবন তার এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯০৭-০৮ সনে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজকর্মে ও অপরদিকে 'ডন'-এর মাধ্যমে জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে অবসর গ্রহণের পর 'ডন' পত্রিকার সুষ্ঠু পরিচালনাই তাঁর জীবনের প্রধানতম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় যুগে 'ডন ম্যাগাজিন' আগাগোড়াই ছিল মাসিক পত্রিকা। এই যুগেও 'ডন' পত্রিকায় পূর্বের ন্যায় তিনটি স্বতন্ত্র অংশ বর্তমান ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ছিল পূর্ববৎ 'ইণ্ডিয়ানা' ও 'টপিকস্ ফর্ ডিস্কাশান্'।

দ্বিতীয় অংশে এই সময় স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা, ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের উপর বড় বড় মনীষীদের মতামত প্রকাশিত হতো — যেমন ডাঃ এ. কে. কুমারস্বামী, লালা লাজপত রায়, সি. এফ্. এণ্ড্রুজ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. ই. স্যাড্লার, এইচ্. এইচ্ অ্যাস্কুইথ্, পি. সি. রায়, ই. বি. হ্যাভেল্, আর. এন্. মুধলকার, হ্যারল্ড কক্স্, রাম্জে্য ম্যাকডোনাল্ড, সিস্টার নিবেদিতা প্রমুখ ব্যক্তির। কখনও কখনও বড় বড় রচনাও এই অংশে ছাপা হতো। সম্পাদক নিজেও এই অংশে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতেন।

এই যুগে পত্রিকার তৃতীয় অংশে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।১৯০৮ সনের প্রথম থেকে ১৯১০ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 'ডন'-এর এই অংশে প্রধান ঠাঁই পেয়েছিল সারা ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ। এরপর জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে এই অংশে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছাড়াও ভারতের অন্যান্য আনুষঙ্গিক শিক্ষা আন্দোলনের বিষয়ও আলোচিত হতে থাকে (মে, ১৯১০ — নভেম্বর, ১৯১৩)।

'ডন' পত্রিকার তৃতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান অংশ হলো 'ইণ্ডিয়ানা' নামক বিভাগ। এই সময় 'ইণ্ডিয়ানা' অংশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার উপর বহুসংখ্যক গবেষণামূলক প্রবন্ধ বের হয়েছিল। এ বিষয়ে সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন অগ্রণী গবেষক ও লেখক। তাঁর রচিত "স্বদেশী ইণ্ডিয়া অর ইণ্ডিয়া উইদাউট ক্রিশ্চান্ ইনফ্লুয়েন্সেস্" প্রবন্ধ আজও পাঠকের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। 'ডন' পত্রিকার ষোলটি সংখ্যায় (জুলাই, ১৯০৯ — অক্টোবর, ১৯১১) এই সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজ বা ক্রিশ্চান্ প্রভাব-মুক্ত ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ঐতিহাসিক গড়ন ও গতি বিশ্লেষণই রচনাটির মূল আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের এক মস্ত বড় দান হলো 'বৃহত্তর ভারত' বিষয়ক গবেষণার প্রবর্তন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও তত্ত্বাবধানে তৎকালে হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 'বৃহত্তর ভারতে'র গবেষণায় ব্রতী হন। ১৯১০ থেকে ১৯১২ সনের মধ্যে হারাণচন্দ্রের উক্ত বিষয়ে বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ 'ডন' পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচিত "প্রাচীন ভারতে সামুদ্রিক অভিযান" এবং "বঙ্গীয় নৌশিল্প ও সামুদ্রিক অভিযান" প্রবন্ধদ্বয় লেখকের মৌলিক গবেষণার পরিচয় প্রদান করে। তাছাড়া, এই সময় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের অনেকগুলি মূল্যবান গবেষণা-প্রবন্ধও উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

তৃতীয় যুগে 'ডন' পত্রিকায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাড়া ভারতীয় শিল্প-বিদ্যার উপরও অনেক সুচিন্তিত রচনা বের হয়েছিল। ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করবার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। তৎকালে ইংরেজ সরকার ভারতীয় শিল্পধারার ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণভাবে উদাসীন এবং সে কারণেই তাঁরা কলিকাতাস্থিত সরকারী অট্টালিকাগুলি সাধারণত ইউরোপীয় কায়দায় নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯০১ সনে কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল্ হলের প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লর্ড কার্জনের মনোভাব ছিল এইরূপ যে—ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধকে বিংশ শতাব্দীর তাজমহল হিসাবে দাঁড় করাতে গেলে তাকে তৈরী করতে হবে ইউরোপীয় স্থপতি-শিল্পের কায়দায়, অবশ্য তাতে ভারতীয় মর্মরের ব্যবহার থাকবে। ভারতীয় স্থপতি-শিল্পের প্রতি সরকারী দরদের এ এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত! নবকল্পিত নয়াদিল্লীতে যে রাজধানী গঠিত হবে তাতে ইউরোপীয় শিল্প-পদ্ধতি প্রয়োগের সপক্ষে সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সরকার অনুসৃত এই নীতির ঘোরতর বিরোধী। মাসের পর

মাস ধরে তিনি সে সময় 'ডন' পত্রিকায় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ ও বিশেষত্ব বর্ণনা করে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন ও ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি গ্রহণের সপক্ষে রীতিমত এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনে দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিশারদ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন — যেমন ই. বি. হ্যাভেল, এ. কে. কুমারস্বামী, মেজর জে. বি. কীথ, রামজে ম্যাকডোনাল্ড ইত্যাদি।

ভারতীয় দৃষ্টির সপক্ষে এই সময় ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ ও হ্যাভেলের রচনা বিলাতের পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। জে. বি. কীথ সুদূর সুইটজারল্যাণ্ড থেকে পত্র লিখে সতীশচন্দ্রের এই মহান কর্মপ্রচেষ্টায় সানন্দ অভিনন্দনও জ্ঞাপন করেছিলেন।[৫] পরিশেষে উল্লেখযোগ্য নয়াদিল্লীর প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির যে গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল, তাতে সতীশচন্দ্রের অবদানও নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর ছিল না।[৬]

সঙ্গীত-চর্চার দিকেও সতীশচন্দ্রের দরদ ছিল নজর কাড়ার মতো। ১৯১০ থেকে ১৯১২ সনের মধ্যে 'ডন' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নিজে ভারতীয় সঙ্গীতের উপর বহু মননশীল রচনা লিখেছিলেন এবং ঐ বিষয়ের উপর ফক্স ষ্ট্রাঙ্গওয়েজ (Fox Strangways), এ. কে. কুমারস্বামী প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীও প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীত-সাধনায় "keyed instruments" (হারমোনিয়াম, অরগ্যান, পিয়ানো প্রভৃতি) অপেক্ষা "stringed instruments" (বেহালা, বীণা, ইত্যাদি) বেশি উপযোগী কিনা এই প্রসঙ্গ নিয়ে তৎকালে 'ডনের' মাধ্যমে এদেশে একটা বড়গোছের আন্দোলন দেখা দেয় এবং সেই আন্দোলনে সতীশচন্দ্রের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত সঙ্গীতবিষয়ক রচনাবলীর প্রতি বহুশাস্ত্রবিদ সংগীতবিশারদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের (স্বামী অভেদানন্দের মন্ত্রশিষ্যের) দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং "এ কী অমূল্য রত্নরাশির তোমরা আমাকে আজ সন্ধান দিলে!" বলে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তিনি আমাদের দু'জনকে আশীর্বাদ করেছিলেন (এপ্রিল, ১৯৫৭)।

(৫) 'ডন ম্যাগাজিন' নভেম্বর, ১৯১২, পৃষ্ঠা ১৯৫ দ্রষ্টব্য।

(৬) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিবর্তনে 'ডন' পত্রিকার দানের বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা লেখকদের *The Origins of the National Education Movement* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২১৪—২৫০) লিপিবদ্ধ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলনে ডন সোসাইটি

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ বিশেষ লক্ষণীয় আকার ধারণ করে—জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের অনুকূলে এক জনমত গড়ে ওঠে। জাতীয় উন্নতির জন্য সকলের আগে প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থের অনুকূল শিক্ষা-ব্যবস্থা। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন জাতীয় স্বার্থের অনুকূল না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনিশ শতকের অষ্টম ও নবম দশকে এই ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে এদেশের চিন্তা-নায়কদের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ইংরেজী শিক্ষার অপূর্ণতায় ও ব্যর্থতায় তৎকালে যে সকল মনীষী বিশেষভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন ও যাঁরা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অগ্রণী হয়েছিলেন, সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৮৯০-৯২ সনে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতায় তৎকালে সুপ্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার গলদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও যে কয়েকটি বিষয়ে সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান তার মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক গবেষণার জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল উল্লেখযোগ্য। "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" ভাবধারার পূর্বাভাস আমরা এইখানে কিছুটা পেয়ে থাকি। প্রায় ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথ "সাধনা" পত্রিকায় "শিক্ষার হের-ফের" প্রবন্ধে (চৈত্র, ১২৯৯) বৃটিশ শাসনে ভারতে প্রচলিত শিক্ষার অপূর্ণতার বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেন ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর দেন। এর কয়েক বৎসর পর সতীশচন্দ্র তাঁর 'ডন' পত্রিকায় (১৮৯৮) শিক্ষার আলোচনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষা কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি—না সরকারী পক্ষকে, না বেসরকারী পক্ষকে। প্রথমত, ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জীবিকা-উপার্জনের পথ সুগম করেনি। লেখাপড়া শিখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেয়েও অধিকাংশ পাশ-করা যুবককেই আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের গুরু দায়িত্ব অস্বীকার করে নিছক পরীক্ষাগ্রহণের ও উপাধি বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে চলেছিল। গবেষক ও পণ্ডিতদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত না হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা নগণ্য। তৃতীয়ত, প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার সবচেয়ে বড় গলদ ছিল এই যে, ঐ

শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাঙ্খার সহায়ক ছিল না। এর মূল দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল বিজাতীয়। দেশের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে এই শিক্ষার আত্মিক সংযোগ ছিল যৎসামান্য। এই বিজাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য ইংরেজের অনুগত দাস-সুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন এক বিরাট কেরাণী জাতি তৈরী করা। স্বামী বিবেকানন্দ এ জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল মানুষ গড়া।

১৯০৭ সনে "বন্দেমাতরম" পত্রে এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা-প্রসঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন ঃ "We are dissatisfied with the conditions under which education is imparted in this country, its calculated poverty and insufficiency, its anti-national character, its subordination to Government and the use made of that subordination for the discouragement of patriotism and inculcation of loyalty."

১৯০৭ সনে অরবিন্দ ঘোষ সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বয়কট করার জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা নিয়ে ইতিপূর্বেই সতীশচন্দ্র প্রমুখ মনীষী বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। আর এই আলোচনা শুধু ভারতীয় মনীষিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—অনেক উদারচরিত, সহানুভূতিশীল বিদেশি পণ্ডিতও এতে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য স্যার জর্জ বার্ডউড, অ্যানি বেশান্ত্, সিষ্টার নিবেদিতার নাম। ১৮৯৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বার্ডউড বিলাত থেকে সতীশচন্দ্রকে লিখিত এক পত্রে ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ক মূল সমস্যার সমালোচনা করেন ও ভারতীয় স্বার্থে জরুরি সংস্কারের কথা উত্থাপন করেন। এই পত্রখানি এত মূল্যবান যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্যতম জনক সতীশচন্দ্র স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পাঠ্যক্রম ১৮৯৮ সনে বার্ডউড নির্দেশিত পন্থাতেই অনেকখানি রচিত হয়েছিল।[১]

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এদেশে যে অসন্তোষ দেখা দেয় তা শুধু চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না—সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাস্তব প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে Society for the Higher Training of Youngmen (১৮৯১) উল্লেখযোগ্য। সরকারী অর্থানুকূল্যে এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যেগে এই পরিষদ ১৮৯১ সনের আগষ্ট

(১) "দ্য ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন", (অক্টোবর, ১৯০৯, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৯) দ্রষ্টব্য।

মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৯৫ সনে ভবানীপুরে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় "ভাগবত চতুষ্পাঠী"। প্রাচীন ভারতে ছাত্রগণ গুরুগৃহে বাস করে আচার্যদের নিকট হতে যেভাবে শিক্ষা পেতো, অনুরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদানের জন্য সংগঠিত হয় "ভাগবত চতুষ্পাঠী"। এই চতুষ্পাঠীর লক্ষ্য শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়নই ছিল না,—ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষাপ্রদানও এর আবেষ্টনে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে এর বড় লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও তাদের প্রাণে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সঞ্চার। এরপর রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সনের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এর প্রাথমিক সংগঠনে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লেখকদের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" গ্রন্থে (১৯৬১) প্রদত্ত আছে।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের" নিয়োগ। ১৯০২ সনের জানুয়ারি মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক এই কমিশন নিযুক্ত হয়। এর একমাত্র হিন্দু সদস্য ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। জুন মাসে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রভাব হ্রাস করে সরকারী কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনুমোদন ছিল। গুরুদাস ব্যক্তিগতভাবে কমিশনের এই রিপোর্টের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত গুরুদাসের লেখা "Note of Dissent" এর প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। বাংলা দেশে এই আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, মতিলাল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্ব দেন এবং নিজ নিজ পত্রিকা মারফৎ কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদ শুরু করেন। কিন্তু এই প্রতিবাদের পরিবেশে সবচেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সতীশচন্দ্র। "ডন" পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ছাড়াও এই সময় তাঁর বহু লেখা "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "বেঙ্গলী"-তে সম্পাদকীয় স্তম্ভে অস্বাক্ষরিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনার প্রতি বিনয় সরকারই বর্তমান লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সতীশচন্দ্র এই সময় শুধু আলোচনা আর সমালোচনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে এক বাস্তব প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকেও অগ্রসর হন। এই প্রচেষ্টার সার্থক পরিণতি "ডন সোসাইটি"। ১৯০২ সনের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই

সোসাইটির জন্ম এবং ১৯০৭ সনের প্রারম্ভে এর বিলুপ্তি। মাত্র চার-পাঁচ বছরের আয়ু নিয়েও এই সোসাইটি জাতীয় আন্দোলনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বস্তুতই বিস্ময়কর।[২]

ডন সোসাইটি ছিল তৎকালে যুবসম্প্রদায়ের এক প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এর কার্যালয় ছিল তৎকালীন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের) দোতলায়। সতীশচন্দ্র ছিলেন এর জেনারাল্ সেক্রেটারী আর মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ও "ইণ্ডিয়ান নেশান" পত্রের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন এর স্থায়ী সভাপতি। ১৯০২ সনের ডিসেম্বরের "ডন" সংখ্যায় উভয়ের স্বাক্ষরিত এক যুক্ত বিবৃতিতে এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কর্ম-প্রণালী প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরবর্তী "ডনের" বহু সংখ্যায়—বিশেষ করে ১৯০৪-১৯০৭ এর মধ্যে—সোসাইটি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যও ছাপা হয়। এই সকল তথ্য আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে উক্ত সোসাইটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত মোলাকাতের ফলে। ডন সোসাইটির ছাত্রদের মধ্যে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কিশোরী মোহন গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার ফলে উক্ত সোসাইটি সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পাই। ডন সোসাইটিতে সতীশবাবুর বিশিষ্ট সহকর্মী হারাণচন্দ্র চাকলাদার এক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছেন। তিনি ছিলেন সোসাইটির সহকারী সম্পাদক। এ বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশী ঋণ বিনয় সরকারের কাছে। বিনয় সরকারই বাংলাভাষায় "ডন সোসাইটি' সম্বন্ধে প্রথম সুবিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রমাণ "বিনয় সরকারের বৈঠকে' (কলিকাতা, ১৯৪২)।

ডন সোসাইটির একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল তৎকালে সরকারী ও বেসরকারী কলেজে প্রদত্ত ছাত্রদের শিক্ষার অব্যবস্থা দূরীকরণ ও এক উন্নততর প্রণালীতে শিক্ষাদান। তৎকালে কলেজে ছাত্ররা যে ধরণের শিক্ষা পেতো তা ছিল একান্তভাবেই পুঁথিগত। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কল্পনার উন্মেষের অপেক্ষা সেই বিদ্যাশিক্ষার আবহাওয়ায় বড় ঠাঁই পেতো কোন প্রকারে পরীক্ষা-পাশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ। যে পরিমাণ শক্তি ও সময় ব্যয়িত হতো, সে পরিমাণ বিদ্যাশিক্ষা হতো না, আর যেটুকুও বা বিদ্যাশিক্ষা হতো, তা জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হতো না। এই অব্যবস্থা দূর করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে ডন সোসাইটি।[৩]

(২) ডন সোসাইটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা লেখকদের *The Origins of the National Education Movement* (কলিকাতা, ১৯৫৭) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

(৩) নগেন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তৃতা ('ডন ম্যাগাজিন', সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, চতুর্থ অংশ, পৃঃ ১-৫ দ্রষ্টব্য)।

সোসাইটির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও চরিত্র গঠন। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে এ ধরণের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। যুবসম্প্রদায়ের চরিত্র গঠন না হলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় । তাই ডন সোসাইটির কর্তৃপক্ষ এই দায়িত্বও সানন্দে গ্রহণ করেন।

সোসাইটির তৃতীয় লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রদান। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় এর কোনো ব্যবস্থা তৎকালে ছিল না, অথচ দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য শিল্প-সংক্রান্ত ও কারিগরী শিক্ষা ছিল একান্ত জরুরি।

সোসাইটির চতুর্থ ও চরম লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের মনে স্বজাতি-প্রীতি, দেশাত্মবোধ ও স্বার্থত্যাগের আকাঙ্খা সঞ্চার করা। মূলতঃ এই চারিটি উদ্দেশ্য নিয়েই ডন সোসাইটি স্থাপিত হয়।

ডন সোসাইটির কাজকর্ম তিনটি মূল শাখায় বিভক্ত ছিল ঃ সাধারণ বিভাগ, শিল্প বিভাগ ও পত্রিকা বিভাগ।[৪] সাধারণ বিভাগ খোলা হয় ১৯০২ সনের জুলাই মাসে। বস্তুত, এই বিভাগ নিয়েই ডন সোসাইটির জন্ম। এর এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯০৩ সনের মাঝামাঝি খোলা হয় শিল্প-বিভাগ। আবার তারও এক বছর পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সনে খোলা হয় পত্রিকা-বিভাগ।

ডন সোসাইটির সাধারণ বিভাগে সপ্তাহে দু'দিন করে ক্লাস নেওয়া হতো। 'ডন' পত্রিকা পাঠে জানা যায় যে, প্রতি রবিবার অনুষ্ঠিত হতো "জেনার‍্যাল্ ট্রেনিং ক্লাস" আর শুক্রবার হতো "মর‍্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস্ ট্রেনিং ক্লাস"। প্রথম দিনে বক্তৃতা হতো ইংরেজীতে —বক্তা থাকতেন স্বয়ং সতীশচন্দ্র। দ্বিতীয় দিনে বক্তৃতা হতো বাংলায় —বক্তা থাকতেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামী। প্রথম দিনের বক্তৃতায় বিষয়বস্তু ছিল রকমারি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কাণ্ডে আলোচনা চালানো হতো। ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা এর কোনটাই আলোচনা-বহির্ভূত ছিল না। আর এই আলোচনা চালানো হতো তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে। কিন্তু যাই আলোচ্য বিষয় হোক না কেন, মূল লক্ষ্য থাকতো জাতীয় স্বার্থসমূহের বিশ্লেষণ এবং পরোক্ষভাবে স্বদেশসেবার আদর্শ-প্রচার। ডন সোসাইটিতে সতীশচন্দ্রের বক্তৃতামালা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার বলেছেন ঃ "ব্যক্তির চেয়ে জাতি বড়, এই ছিল মুদ্দা। পরিবারের চেয়েও দেশ বড় এই মন্তরই প্রচারিত হতো নানা আকারে। কোনো দিন স্পেন্সারের বাণী, কোনো দিন মিলের বয়েৎ, কোনো দিন কার্লাইলের বুখ্নি। কিন্তু যাই আলোচিত হোক না

(৪) "ডন ম্যাগাজিনে" প্রদত্ত ডন সোসাইটির কাজকর্মের হিসাব দ্রষ্টব্য (জুলাই, ১৯০৫)

কেন,—ডাইনে বাঁয়ে পায়তারা করতে করতে সতীশবাবু এসে দাঁড়াতেন তাঁর স্বদেশনিষ্ঠায়।

"প্রত্যেক দিনই ঘুরে-ফিরে এসে হাজির হ'তাম স্বার্থত্যাগের দর্শনে। বুঝতে পারতাম,—বিবেকানন্দ-বাঞ্ছিত 'একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামির' জ্যান্ত প্রতিমূর্তি সতীশ মুখোপাধ্যায়। সতীশবাবুর আবহাওয়ায় পড়েছিলাম বলে জীবন ধন্য হয়েছে।" [৫]

দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় থাকতো গীতার কর্মযোগ ও গীতার আদর্শ। "বৈঠকে" বিনয় সরকার বলেছেন ঃ "গীতার শ্লোকগুলা ধ'রে-ধ'রে শব্দের পর শব্দ বুঝিয়ে দেওয়া হ'তো। পণ্ডিত নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাগুলা কানে ঠেক্‌তো অতি মধুর আর মিশে যেত রক্তের সঙ্গে। প্রত্যেক দিন শুনতাম এক সুর। তা হচ্ছে ঃ-

'শরীর কিছু নয়, প্রাণ কিছু নয়, মৃত্যু কিছু নয়। একমাত্র জিনিষ কর্তব্য-পালন'। সেই সুর আজও কানে বাজ্‌ছে। আর তারই জোরে বেঁচে রয়েছি।"

ডন সোসাইটির সভ্যরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ বিশিষ্ট সভ্য (Recognised Member) ও সাধারণ সভ্য (Ordinary Member)। যে-সকল সভ্য জেনার‍্যাল্ ট্রেনিং ও মর‍্যাল ট্রেনিং উভয় ক্লাসেই শতকরা অন্ততপক্ষে ষাটটি বক্তৃতায় উপস্থিত হতো এবং যারা ক্লাসের নির্দিষ্ট কাজ নিয়মিত সম্পন্ন করতো, তারা ছিল এই সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্য। আর যারা সোসাইটি-অনুষ্ঠিত যে কোনো ক্লাসে অন্ততপক্ষে শতকরা পঞ্চাশটি বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করতো, তাদের বলা হতো সোসাইটির সাধারণ সভ্য। ১৯০৫-০৬ সনে ডন সোসাইটিতে উভয় শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা কমপক্ষে ছিল একষট্টি জন। ১৯০৬ সনের মার্চের "ডন" পত্রিকায় যে একষট্টি জনের নাম প্রদত্ত আছে তার মধ্যে বাঙালী-অবাঙালী উভয়বিধ ছাত্রই ছিল। ঐ রিপোর্টে বিনয় কুমার সরকার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরী মোহন গুপ্ত ইত্যাদির নাম দেখতে পাই। উক্ত রিপোর্টে হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত না হলেও একথা সুনিশ্চিত যে তাঁরা উভয়েই ডন সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে পাণ্ডাস্থানীয় ছিলেন। তাছাড়া, ডন সোসাইটির ক্লাসে অনিয়মিতভাবেও বহু ছাত্র উপস্থিত থাকতো। বিনয়বাবু "বৈঠকে" বলেছেন যে, "পঁচাত্তর বা গোটা শ'য়েক" ছাত্রকে তিনি অনেক সময় ডন সোসাইটির ক্লাসে একসঙ্গে পেয়েছেন। এই সোসাইটিতে যে সকল ছাত্র অনিয়মিতভাবে আসতেন, তাঁদের মধ্যে প্রফুল্লকুমার সরকার, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ সরকার, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও রাধাকমল

* (৫) "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ২৬২-৬৩)

মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই নিজ নিজ জীবনে সতীশচন্দ্রের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

ডন সোসাইটির সাধারণ বিভাগে শিক্ষাপদ্ধতির দু'টি বিশেষত্ব ছিল—"রেকর্ড বই" (Record Books) ও আলোচনা-চক্র (Discussion Classes)। প্রত্যেক দিন ক্লাসে ছাত্ররা বক্তৃতার চুম্বক নিজ-নিজ নোট বই-এ লিখে নিতো। বক্তৃতার শেষে সোসাইটি থেকে ছাত্রদের কাগজ ও পেন্সিল দেওয়া হতো। ঐ খাতায় ছাত্রগণ সাধারণ বক্তৃতার দুই দিনের মধ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রবন্ধাকারে লিখে Literary Secretary-র কাছে ফিরিয়ে দিতো। Literary Secretary ছাত্রদের মধ্যেই কোনও একজন থাকতো। পরে জেনার‍্যাল সেক্রেটারী অর্থাৎ সতীশচন্দ্র নিয়মিতভাবে খাতাসমূহ পরীক্ষা করতেন ও প্রয়োজনমত ছাত্রদের গঠনমূলক উপদেশ দিতেন। সভাপতি নগেন্দ্রনাথ ঘোষও কখনো কখনো ছাত্রদের 'খাতা' দেখতেন। ঐ খাতাগুলিকে Record Books বলা হতো। রেকর্ড বইগুলি ছিল সোসাইটির সম্পত্তি। এই সকল রেকর্ড বইয়ে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যেতো।

তাছাড়া, আলোচনা-চক্র ছিল সোসাইটির আর একটি বিশেষত্ব। সতীশচন্দ্র মাঝে মাঝে যে কোনো ক্লাসের দিনে উপস্থিত সভ্যদের ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিতেন এবং সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়বস্তু থেকে প্রাসঙ্গিক কতকগুলি প্রশ্ন বেছে প্রত্যেক দলকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার নির্দেশ দিতেন। ছাত্রদের মধ্য থেকেই প্রত্যেক দলের জন্য একজন সভাপতিও স্থির করে দেওয়া হতো। এই সভাপতির পরিচালনায় প্রত্যেক দল স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা চালাতো ও সভ্যগণ নিজ নিজ মন্তব্য রেকর্ড বইয়ে লিপিবদ্ধ করতো। পরিশেষে এই সকল আলোচনার বিবরণী ও ভোটাধিক্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত দলীয় সভাপতি কর্তৃক পেশ করা হতো সোসাইটির জেনার‍্যাল সেক্রেটারীর নিকট।

ডন সোসাইটির কর্ম-প্রণালীতে স্বায়ত্ত-শাসন নীতির ঠাঁই ছিল খুব উঁচুতে। এই বিষয়ে বিশিষ্ট সভ্যদের ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। বিশিষ্ট সভ্যগণ নিজেদের নির্বাচিত সভাপতি ও কার্যনির্বাহক সমিতির তত্ত্বাবধানে সোসাইটির আভ্যন্তরীণ শাসনসংক্রান্ত সকল কাজকর্ম পরিচালনা করতো।

নিয়মানুবর্তিতা ও যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাও ডন সোসাইটিতে ছিল। কোন্ কোন্ সভ্য এইরূপ পুরস্কার পাবার যোগ্য, তাও নির্ধারণের মূল দায়িত্ব ছিল সভ্যদের উপর। প্রধানত, ছাত্রদের ভোটের দ্বারাই এ বিষয়ে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। পুরস্কার, পদক ও বৃত্তিদানের জন্য পৃথক ভোটের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল ব্যাপারে বিশিষ্ট সভ্যের দু'টি ও সাধারণ সভ্যের একটি করে ভোট থাকতো।[৬] বৎসরান্তে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে সোসাইটির পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হতো।

ডন সোসাইটির দ্বিতীয় শাখা ছিল এর শিল্প-বিভাগ। এই শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে প্রধান উৎসাহী কর্মী ছিলেন কিরণ চন্দ্র বসু। ১৯০৩ সনে এই বিভাগের পরিচালনায় এক স্বদেশী দোকান খোলা হয়। এই দোকানে স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। ডন সোসাইটির শিল্প বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় ঃ "এখানে ভারতের নানা স্থানের কলের ও হাতের তৈয়ারী সকল প্রকার ধুতি, শাড়ী, নয়ানসুক, মার্কিন, টীকিন, চেক ও ফ্যান্‌সী ছিট, টুইল, লংক্লথ, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, তোয়ালে, গেঞ্জি, রুমাল, মোজা, পীতবস্ত্র, এসেন্স, সাবান, চিঠির কাগজ, এলুমিনামের দ্রব্যাদি, আইভরী বোতাম, জুতার ক্রিম, ছুরি, কাঁচি, ইস্কপিল, নিভ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়।" মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার জন্য সাধারণ ও ভিঃ পিঃ ডাকে মাল পাঠানোর ব্যবস্থাও ছিল।

শিল্প-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত তিনটি ঃ— প্রথমত, দেশের শিল্পবিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা; দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ী বিদ্যায় তাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া ও করিৎকর্মা করে তোলা; তৃতীয়ত, স্বদেশী শিল্পের প্রতি তাদের মনে যথার্থ দরদ সঞ্চার করা।

ডন সোসাইটির শিল্প-বিভাগ সংগঠন করার সঙ্গে তৎকালীন দুইজন প্রখ্যাতনামা বাঙালী ব্যবসায়ী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন কে. বি. সেন (বড়বাজারের বস্ত্র-ব্যবসায়ী) ও দ্বিতীয়জন ছিলেন জে. চৌধুরী (বহুবাজারস্থ 'ইণ্ডিয়ান স্টোর্সে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর)।[৭] সোসাইটির স্বদেশী দোকান পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সোসাইটি কর্তৃক নির্বাচিত একটি "বিজনেস্ সেকশানের" উপর। ডনের প্রবীণতম সদস্য হারাণচন্দ্র চাকলাদার ছিলেন এই সেকশানের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। দোকানে মাল-সংগ্রহের ও বেচা-কেনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের। টাকায় এক আনা লাভে ঐ মাল বিক্রয় হতো। বেচা-কেনার হিসাবও রাখতে হতো ছাত্রদেরই। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত স্বদেশী দোকান খোলা থাকতো। ছাত্রদের এই সমস্ত কাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক। বিক্রয়লব্ধ

(৬) "ডন ম্যাগাজিন" (মার্চ, ১৯০৬, চতুর্থ অংশ, পৃঃ ১-৪) দ্রষ্টব্য।

(৭) নগেন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তৃতা ('ডন ম্যাগাজিন', সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, চতুর্থ অংশ, পৃঃ ১-৫)

অর্থ থেকে তারা নিজেরা এক কপর্দকও গ্রহণ করতে পারতো না। বৎসরান্তে যে সামান্য লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকতো (প্রদর্শনী অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন ছাপানো ইত্যাদি বিষয়ে খরচের পর) তা ছাত্র-ক্রেতাদের মধ্যেই আবার ক্রীত মূল্যে গুরুত্ব অনুসারে প্রথম কয়েকজনকে বন্টন করে দেওয়া হতো। শিল্প-বিভাগ খোলার পর প্রথম বছরই (১৬ই জুন, ১৯০৩—১৫ই জুন, ১৯০৪) এই বিভাগ থেকে প্রায় দশ হাজার টাকার স্বদেশী দ্রব্য বিক্রীত হয়। এর লভ্যাংশ কমপক্ষে দশজন ছাত্র-ক্রেতাকে দেশীয় দ্রব্যাকারে পুরস্কার দেওয়া হয়। এইভাবে ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় ছাত্রগণ স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

দেশবাসীর প্রাণে স্বদেশী ভাব সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে ডন সোসাইটির উদ্যোগে মাঝে-মাঝে স্বদেশী শিল্প-বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থাও থাকতো এবং মাঝে-মাঝে স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হতো। প্রথম বছরে (জুন, ১৯০৩—জুন, ১৯০৪) শিল্প-বিভাগের তদ্বিরে দু'বার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। একবার বক্তৃতা করেন ইণ্ডিয়ান স্টোর্স বা ভারত-ভাণ্ডারের জে. চৌধুরী; আর একবার বক্তৃতা করেন বড়বাজারের বস্ত্র ব্যবায়ী কে. বি. সেন। উভয় বক্তৃতাতেই সভাপতিত্ব করেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। এই সকল বক্তৃতায় বাইরের বহু ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া, প্রথম বছরেই আবার দু'বার শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়—একবার ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে আর একবার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। ১৯০৫ এর জুলাই মাসে ডন সোসাইটির উদ্যোগে যে শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। প্রায় তিন হাজার লোক এই প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন। আগন্তকদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেন, ভূপেন্দ্র নাথ বোস, সিস্টার নিবেদিতা, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, ইন্দুমাধব মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল্ প্রমুখ বহু বিদেশি ব্যক্তি ও অনেক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। হ্যাভেল সাহেব ঐ প্রদর্শনীতে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে ডন সোসাইটির বিশেষ তারিফ করেন ও কলিকাতায় একটি বয়ন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। এই শিল্প-প্রদর্শনী দুপুর ২-৩০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত খোলা ছিল। ৬টার সময় প্রদর্শনী বন্ধ করায় বহু লোক নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। তৎকালীন "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "বেঙ্গলী" পত্রে সম্পাদকগণ এই মর্মে ডন সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান যে, ঐ ধরণের শিল্প-প্রদর্শনী ভবিষ্যতে যেন একদিনের পরিবর্তে অন্ততঃ তিনদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।[৮]

(৮) "ডন ম্যাগাজিন" (সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, চতুর্থ অংশ, পৃঃ ৫-৬) দ্রষ্টব্য।

এইভাবে নানাবিধ উপায়ে,—স্বদেশী দোকান প্রতিষ্ঠা করে, স্বদেশী দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ক্রেতাদের মধ্যে পুরস্কার বন্টন করে, স্বদেশী শিল্প-বিষয়ক বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে এবং সর্বোপরি স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত একদল তরুণ ছাত্রকে তৈরী করে,—ডন সোসাইটি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি রচনা করে। সার্বজনিক সভায় বাংলার জননায়কগণ বিলাতী মাল বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্প গ্রহণ করেন ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট। কিন্তু ঠিক অনুরূপ আদর্শই ডন সোসাইটি প্রচার করে, শুধু প্রচার নয়, ঐ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টাও করে অন্তত পক্ষে দু'বছর পূর্ব থেকে। ডন সোসাইটির শিল্প-বিভাগ তৎকালীন যুবসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ মণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এক লিপিতে আমাদের জানিয়েছেন যে, সতীশচন্দ্র তৎকালে স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রতি কীভাবে বহু ছাত্রের মনে মমত্ববোধ জাগিয়েছিলেন! সোসাইটির শিল্প-বিভাগ পরিদর্শন করতে এসে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন ও একসময় তিনি নিয়মিতভাবে ডন সোসাইটির সাধু উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবার জন্য সতীশচন্দ্রের হাতে মাসিক ১০্ টাকা করে সাহায্য দানও করতেন।

ডন সোসাইটির তৃতীয় শাখা ছিল পত্রিকা বিভাগ। এই বিভাগ খোলা হয় সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ থেকে। ঐ সময় "ডন" পত্রিকা (১৮৯৭ সনের মার্চ মাসে প্রথম প্রতিষ্ঠিত) উক্ত সোসাইটির মুখপত্রে রূপান্তরিত হয় ও "দ্য ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন" নাম ধারণ করে। ঐ নামে পত্রিকা চলেছিল ১৯১৩ সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত। কিন্তু পত্রিকাখানি ডন সোসাইটির 'সত্যকার' মুখপত্র হিসাবে কাজ করে মাত্র দুই বছর (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪—জুলাই, ১৯০৬)। ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কাজকর্ম পুরাদমে আরম্ভ হলে ঐ পত্রিকা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মুখপত্র রূপে পরিণত হয়। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত ডন ম্যাগাজিন মূলত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বাণীই ঘোষণা করে। ১৯১০ থেকে ১৯১৩ এই চার বছর ডন পত্রিকায় প্রাধান্য লাভ করে ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য, সংগীত ও ইতিহাসের আলোচনা।[৯]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০৪-০৬ এর যুগে পত্রিকার মূল লক্ষ্য হলো ভারত বিষয়ক গবেষণা। "দেশকে ভালবাসতে হলে দেশকে জানতে হবে" এই মন্ত্র নিয়ে সতীশচন্দ্র ডনের দ্বিতীয় পর্বে 'ইণ্ডিয়ানা' নামক অংশ পত্রিকায় প্রবর্তন

(৯) লেখকদের *The Origins of the National Education Movement* গ্রন্থখানি এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

করেন। এই অংশে ভারতীয় নরনারী, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার, রীতিনীতি, ভাষা, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সংখ্যাশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো। তাছাড়া, ঐ পর্বে পত্রিকার আরও কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয় ছিল—যেমন 'টপিক্স্ ফর ডিস্কাশান্', 'স্টুডেন্টস্ সেক্শান', 'করেসপণ্ডেস্ কলাম' ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের প্রবর্তন। এই সময় পত্রিকার প্রচার ও প্রচলন পূর্বের থেকে বেড়ে যায় অনেকখানি। ভারতের নানা প্রান্তে,—যেমন কলিকাতা, ত্রিবাঙ্কুর, গুজরাট, বরোদা, তাঞ্জোর, পাঞ্জাব, ভিজাগাপট্টম্, বিহার, পুণা, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, বম্বে ইত্যাদি স্থানে,—এর পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা ছিল বহুসংখ্যক। তৎকালে ভারতের নানা প্রান্তে অবস্থিত ছাত্ররা ডন পত্রিকার "Correspondence Column" -এর মারফৎ পারস্পরিক ভাববিনিময় করতে পারতো। পত্রিকার এই অংশে ভারতের এক প্রান্তের ছাত্রেরা কতকগুলি প্রশ্ন করে উত্তর চাইতো অন্যান্য ছাত্রদের কাছ থেকে। ডন পত্রিকায় সেই সকল প্রশ্ন ও উত্তর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো। এইভাবে ভারতীয় ছাত্রেরা ডনের মারফৎ পরস্পরের কাছে আসতে পেরেছিল অনেকখানি।

আর একটা বিশেষত্বও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সতীশচন্দ্র ডন ম্যাগাজিনে প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করে ভারতের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় বিপুল উৎসাহ দিয়েছিলেন। সেকালে যাঁরা অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় পথপ্রদর্শকের কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র নিঃসন্দেহে একজন। সতীশচন্দ্র শুধু নিজে গবেষণামূলক লেখা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, ডনের মাধ্যমে একদল উৎসাহী লেখক-গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছিলেন। এবিষয়ে তিনি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসাধক। সতীশচন্দ্রের হাতে-গড়া ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এঁদের মধ্যে হারাণচন্দ্র চাকলাদার (ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্বসেবী), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক), রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও ঐতিহাসিক), বিনয়কুমার সরকার (ঐতিহাসিক, সমাজশাস্ত্রী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী), রাজেন্দ্রপ্রসাদ (স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতি ও ঐতিহাসিক), উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (ঐতিহাসিক), প্রফুল্লকুমার সরকার (সাংবাদিক ও সমাজ-দার্শনিক) ও মহেন্দ্রনাথ সরকার-এর (দর্শন-সেবকের) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নয়া ভারতের জাতীয় জীবনে এঁদের সাংস্কৃতিক দান এক বিশেষ গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্বেই ডন সোসাইটি বাংলা দেশে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও স্বদেশসেবার কর্মকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে চলে। তৎকালীন মনীষীদের মধ্যে যাঁরা এর গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিস্টার নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তির নাম স্মরণীয়। এঁদের কেউ কেউ ১৯০২-০৬ সনের মধ্যে ডন সোসাইটির সাধারণ বিভাগে মাঝে-মাঝে বক্তৃতাও প্রদান করেছেন। ১৯০৬ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ডন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা প্রদান করেন তার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে সোসাইটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ও দরদ। রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় প্রকাশ্য সভায় স্বদেশী আন্দোলনে ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্রের বিশেষ দান সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। ঐ বক্তৃতায় ডন সোসাইটির ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ

"আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি সত্য কিন্তু আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে কি বলিবার আছে তাহা ভাবি নাই। আপনারা যে ভাবে দীক্ষিত এবং অভ্যস্ত হইয়াছেন তাহাতে বাহিরের কোন উত্তেজনার প্রয়োজনও আপনাদের নাই। সতীশবাবু যে সময় ডন্ সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না, শিক্ষা সম্পর্কীয় এই National Movement-এরও তখন সূত্রপাত হয় নাই। এমন দিনে সতীশবাবু দূরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাহিরের উৎসাহ উত্তেজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া মহৎ লক্ষ্যমাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সভা সাময়িক কোন বৃহৎ উত্তেজনা উদ্দীপনার মুখে তৈয়ার হয় নাই, আপনারা সেই সভার আকর্ষণে এখানে মিলিয়াছেন। এতদিন ধীরে ধীরে ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, এখন তাহা পল্লবিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।......বাহিরের মাদক পদার্থে ক্ষণিক একটা উত্তেজনা জন্মে, কিন্তু কিছু পরেই আবার অবসাদ উপস্থিত হয়। আপনারা সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। বীজ যেমন গোপনে ধীরে ধীরে মাটী হইতে জীবনী-শক্তি সংগ্রহ করে, আপনারাও ভিতর হইতে তেমনি জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন।

"আপনাদের সোসাইটির কথা এতক্ষণ বলিলাম। আরো একটা কথা বলিব। আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, সতীশবাবু তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন। তাঁহার উৎসাহেই ইহা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আমরা

এই স্বদেশী আন্দোলনে যতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ভাবি না যে গর্বের সঙ্গে আমাদের লজ্জার বিষয়ও আছে। আমরা ইতিমধ্যে যে যে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলাম, আর যেগুলি উৎসাহের অভাবে মারা যাইতেছে বলিয়া আজ আক্ষেপ করিতেছি, সেগুলিকে সফল করিবার জন্য আমরা এমন কোনও স্বার্থত্যাগ করিতে পারি নাই যাহা ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এখনও আমাদের ত্যাগস্বীকারের মাত্রা এতটা উঠে নাই যাহাতে জাতি যথার্থই গৌরবান্বিত হইতে পারে। এই বিদ্যালয়কে সফলতা দান করিতে হইলে আপনাদিগকে এই কর্ম্মে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে। জীবন সমর্পণ করার মত বড় কথা আমার মুখে শোভা পায় না কেননা আমি নিজে বিশেষ কোন স্বার্থত্যাগ করিতে পারি নাই। যিনি আপনাদের চালক তিনি আপনাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া আছেন। তাঁহার জীবন আপনাদিগকে এ ব্রতের জন্য আহ্বান করিতে পারে।" [১০]

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে ডন সোসাইটির আত্মিক প্রভাব বেড়ে যায় পূর্বের থেকে আরো অনেক বেশি। সে সময় এই সোসাইটি বয়কট ও স্বদেশীভাবের এক বিপুল কর্মকেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবেই পরিণত হয়েছিল। বিনয় সরকার 'বৈঠকে' বলেছেন, "১৯০৫-এর আগষ্ট মাসে বিলাতী বয়কট্ চালু হ'ল কল্‌কাতায়। তারপর হ'তে দেশশুদ্ধ হৈ-হৈ রৈ-রৈ। তখন কে যে কাকে চেনে আর কে যে কাকে চেনে না ঠাওরাবার সাধ্য কার? দিন নাই, রাত নাই, চব্বিশ ঘণ্টা লোকের ভীড় সতীশবাবুর ঘরে। শুধু কি কল্‌কাতার লোকই আস্‌ত? কোথায় চাটগাঁ-কুমিল্লা? কোথায় আসাম? কোথায় বরিশাল-ময়মনসিংহ? কোথায় মেদিনীপুর-বীরভূম? কোথায় দিনাজপুর-বগুড়া? কেউ যাবে জাপানে-আমেরিকায়;— ছুটো সতীশবাবুর কাছে। কেউ বসাবে গেঞ্জির কল;— ছুটো সতীশবাবুর কাছে। কেউ করাবে বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট্;— ছুটো সতীশবাবুর কাছে। যত রাজ্যের যত ছোঁড়া- বুড়ো,—সব এসে হাজির হ'ত সতীশবাবুর নিকট হদিশ্ নিতে।" এইভাবে ডন সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিধি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রসারিত হয় বিপুলভাবে। ১৯০৫-এর শেষদিকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের জন্য ও শিক্ষা-স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু হলে ডন সোসাইটি তারও প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐ বৎসরের নভেম্বর মাসে ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের জন্য বাংলার জননায়কদের কাছে এক ফতোয়া জারী করেন। ১৬ই নভেম্বর জননায়কদের এক

(১০) "ডন ম্যাগাজিন" (মার্চ, ১৯০৬, বাংলা অংশ, পৃঃ ৩৫-৪০)।

বিরাট সভায় সুদীর্ঘ আলোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় জাতীয় কর্তৃত্বে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ষোলকলায়পূর্ণ এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প। ১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) ও ১৪ই আগষ্ট এরই পরিচালনাধীনে Bengal National College and School-এর উদ্বোধন ঘটে। অরবিন্দ ঘোষ এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ আর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল সংগঠনের ইতিহাসে ডন সোসাইটি ও সতীশচন্দ্রের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫-০৬ সনের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস মূলতঃ সতীশচন্দ্রের জীবনকথার নামান্তর,—বিনয় সরকারের এই অভিমত ঐতিহাসিক বিচারে অতিরঞ্জিত নয়।

পরিশেষে ডন সোসাইটির জীবনায়ু কবে সমাপ্ত হলো এ বিষয়ে অনেকের ভুল ধারণা বর্তমান। বিনয়বাবু "বৈঠকে" (২৬৪ পৃষ্ঠায়) কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "ডন সোসাইটির কাজ বন্ধ হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। সে হচ্ছে ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি।" ঠিক একথাই তিনি আবার তাঁর *Education for Industrialization* গ্রন্থেও (পৃঃ ৭৬) লিখেছেন। আবার শ্রদ্ধেয় গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীও "উদ্বোধনে" প্রকাশিত তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ" রচনায় (পৌষ, ১৩৫০, পৃঃ ৫৪৭) অনুরূপ তথ্য পরিবেষণ করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলতে চান যে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে জন্ম দিয়েই ডন সোসাইটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই অভিমত পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে, আর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ স্থাপিত হয় ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে। ১৯০৬ সনের মার্চে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর কার্যালয় ছিল ৫নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে (জুলাই, ১৯০৬ পর্যন্ত), কিন্তু ডন সোসাইটির অফিস ছিল সেই পুরানো মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ২২নং শংকর ঘোষ লেনে (জুলাই, ১৯০৬ পর্যন্ত)। আগষ্ট মাসে উভয়েরই কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় ১৯১/১ বহুবাজার ষ্ট্রীটে। ১৯০৬-এর শেষ পর্যন্ত ডন সোসাইটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। ১৯০৭ সনের জানুয়ারি মাসে ডন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সোসাইটির সেক্রেটারী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে, ১৯০৭ সনের জন্য তিনি সোসাইটির নূতন সদস্য সংগ্রহ করতে আগ্রহান্বিত। ১৯০৭ এর জানুয়ারির পর এ ধরণের বিজ্ঞপ্তি আর প্রকাশিত হয়নি। কাজেই এ থেকে এটুকু নিশ্চিত

করে বলা যায় যে, ১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে জন্ম দিয়েই ডন সোসাইটির জীবনমেয়াদ সাঙ্গ হলো না। ডন সোসাইটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় ১৯০৭-এর জানুয়ারি মাসের পূর্বে নয়। এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হওয়ার কারণ হলো এই যে, যে-ভাবধারা এই সোসাইটি গত চার বৎসর যাবৎ প্রচার করে চলেছিল, তারই বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে ১৯০৭-এর জানুয়ারিতে ডন সোসাইটির আনুষ্ঠানিক মৃত্যু হলেও আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়নি। তখন সোসাইটির ভাবধারা ও কর্ম-প্রণালী গ্রহণ করে এগিয়ে চল্‌লো জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। "জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই ডন সোসাইটির শেষ কাজ"—বিনয় সরকারের এই উক্তি অবশ্যই স্বীকার্য।

ডন সোসাইটি পরিচালনাকালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম দিকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে এক বন্ধুর বাসায় বসবাস করতেন (১৯০২-১৯০৪)। ঐ সময় তিনি প্রত্যহ বিকেলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবাস ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে বেড়াতে যেতেন এবং সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাছাই-করা ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতেন। ঐ হোষ্টেলে তখন থাকতেন তাঁর প্রধান তিন 'পেটোয়া'—রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও বিনয়কুমার সরকার। রাধাকুমুদবাবুর ঘরই তখন হয়েছিল সতীশবাবুর বৈকালিক ও সন্ধ্যাকালীন আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রস্থল। সেই ঘরে সতীশবাবুর কথা শুনতে হোষ্টেলের অন্যান্য ছাত্রও এসে জড়ো হতো। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ তৎকালে উক্ত হোষ্টেলের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঐ আলোচনায় এসে অংশ গ্রহণ করতেন ও পরে ডন সোসাইটির একনিষ্ঠ সাধক ও কর্মীতে পরিণত হয়েছিলেন।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকাকালীন সতীশবাবু কীভাবে জীবনযাপন করতেন, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া কঠিন। এই সময় তিনি আপন কাজে এত বেশি মগ্ন থাকতেন যে বাইরের অন্য কিছুর দিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকতো না বলেই মনে হতো। তৎকালে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের ৩২নং বাড়ীতে একটি মেস্ ছিল। ঐ মেসের জনৈক অধিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র (অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ) এক লিপিতে (২৫.১২.১৯৫২) আমাদের জানিয়েছেন ঃ "সতীশবাবুর চেহারাটা আজও আমার মনে পড়ে। গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন ক্ষীণাঙ্গ পুরুষ। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তির আকৃতি যেমন হয়। অতি সরল প্রকৃতির আপনভোলা লোক ছিলেন তিনি। বোধ হয় তিনি আপনার কাজে এত মগ্ন থাকিতেন যে সংসারের অন্য কোনও ব্যাপারের

প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। এখানে একটি মজার কথা আমার মনে পড়িতেছে। সতীশবাবু মাঝে-মাঝে আমাদের মেসে আহার করিতেন। কখনও কখনও তাঁহার সহিত খাইতে বসিয়াছি। তাঁহার খাইতে বসিবার ভঙ্গীটি ছিল অদ্ভুত। তিনি বসিতেন অনাবৃত ভূমিতে এবং বসিবার পিঁড়িটির উপর কনুয়ের ভর দিয়া সেটিকে তাকিয়ার কাজে লাগাইতেন। একদিন খাইবার সময় তাঁহার মাছের ঝোলটীর আস্বাদন বড় ভাল লাগিল। সে ঝোল চিংড়ী মাছের এবং তাঁহার বাটীতেও সেই মাছই ছিল। অথচ তিনি পাচককে বলিলেনঃ 'ঠাকুর, আজ ঝোল বড় ভাল হয়েছে, কি মাছের ঝোল, বাটা মাছের ঝোল বুঝি?' ঠাকুর বলিল ঃ 'না বাবু, চিংড়ী মাছের ঝোল।' সতীশবাবু বলিলেন ঃ 'চিংড়ী মাছের? আমার ধারণা বাটা মাছের ঝোলই খুব ভাল হয়।' এতেই বুঝা যায় যে সতীশবাবু কোনটা চিংড়ী মাছ, কোনটা বাটা মাছ তাও বোধ হয় জানিতেন না।"

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কিছুকাল বসবাসের পর সতীশচন্দ্র কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে আস্তানা স্থাপন করেন। ১৯০৫ সনের জুন মাসে রাধাকুমুদ-রবি ঘোষের সঙ্গে বিনয় সরকারও ইডেন হিন্দু হোষ্টেল ছেড়ে দেন এবং সতীশবাবুর তদ্‌বিরে তাঁরা এক মেসের ব্যবস্থা করেন। সেই মেসের কর্মকর্তা হলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে এলেন মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী।[১১] ব্রহ্মবান্ধব-সতীশচন্দ্র পরিচালিত এই মেস ছিল ১৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর একটা বড় মাঠওয়ালা বাড়ীর দোতলায়। ঐ বাড়ী রাজবাড়ী নামে পরিচিত ছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, ঐ বাড়ীর মালিক ছিলেন মহেন্দ্র দাস।[১২] এই রাজবাড়ীর ঠিকানা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের নামে থাকলেও ঐ বাড়ীর প্রবেশপথ ছিল শিবনারায়ণ দাসের গলি দিয়ে। বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তৎকালে সেখানে ছিল এক পতিত জমি। লোকেরা ঐ জমিকে বলতো 'পান্তের মাঠ' বা 'পান্তির মাঠ'। সেই মাঠেরই উত্তর-পূর্বে ছিল রাজবাড়ী। সেই রাজবাড়ীর দোতলায় সতীশচন্দ্র-ব্রহ্মবান্ধবের মেস। আর নীচতলায় 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী ক্লাব।'

সেই ক্লাবে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী,

---

(১১) "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ২৮৪)

(১২) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস" (কলিকাতা, ১৯২৮, পৃঃ ১২৩)

রজতনাথ রায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ ব্যক্তি।[১৩] বিনয় সরকার দোতলার মেসকে 'সতীশ-মণ্ডল' ও একতলার ক্লাবকে 'সুবোধ-মণ্ডল' বলে 'বৈঠকে' অভিহিত করেছেন। এই দুই মণ্ডলের উদ্দেশ্য ও গঠন-প্রণালী স্বতন্ত্র হলেও স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে উভয়েই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল এবং স্বদেশী আন্দোলন সংগঠনে ও পরিচালনায় উভয়েরই দান ছিল বিরাট। সেকালের শ্রেষ্ঠ জননায়কগণ—যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ইত্যাদি ব্যক্তি—এই দুই মণ্ডলে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতেন। বিনয় সরকার বলেছেন ঃ "সতীশবাবুর পেটোআ হিসাবে আমরা নিজ-নিজ চৌকিতে বসেই কল্‌কাতার জন-নায়কগণকে মুঠোর ভেতর পাকড়াও করতে পারতাম। এজন্য কারু উমেদারি করার দরকার হ'ত না।[১৪] উক্ত মেস ও ক্লাবের সম্মুখস্থ পান্তির মাঠে প্রায় প্রত্যহই জননায়কগণের বক্তৃতা হতো—বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবার পর থেকে (৭ই আগস্ট, ১৯০৫)। বস্তুত, ১৯০৫-০৬ সনে এই পান্তির মাঠ বাংলার দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের এক বিরাট সভাগৃহ বা বক্তৃতামঞ্চে পরিণত হয়। 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী ক্লাব'কে প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার ১৯০৫-এর গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের 'গ্রীণ রুম' বলে বিশেষিত করেছেন।

এক বৎসরকাল ১৬নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাসায় থাকার পর (জুন, ১৯০৫ থেকে জুন, ১৯০৬) সতীশবাবু তাঁর তিন "পেটোআ" অর্থাৎ রাধাকুমুদ, রবি ঘোষ ও বিনয় সরকারকে সঙ্গে নিয়ে ৩৮/২নং শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়ীতে উঠে যান। সেখানকার নূতন মেসের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের আর কোন সংশ্রব ছিল না। শিবনারায়ণ দাস লেনের এই বাড়ীতে সতীশবাবু তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে ১৯০৮-এর শেষ পর্যন্ত জীবন কাটিয়েছেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের ও তৎসংশ্লিষ্ট জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কাজকর্ম পুরাদমে চলেছে। এবার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্মকথা, কর্মপ্রচেষ্টা, এবং তাতে সতীশচন্দ্রের দানের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

(১৩) "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থের ২৮৪-২৮৮ পৃষ্ঠায় ও বিনয় সরকারের "আড্ডাধারী সুকুমার" প্রবন্ধে (যা প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ সনে প্রকাশিত হয় তাতে) এই সকল তথ্য বিবৃত আছে।

(১৪) "বিনয় সরকারের বৈঠকে", পৃঃ ২৮৭-২৮৮ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়
'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ

১৯০৫ সনে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'র অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় শিক্ষা'র মন্ত্রও দেশের দিগন্ত থেকে দিগন্তে ধ্বনিত হয়। শিক্ষা-স্বরাজ ও শিক্ষা-স্বাদেশিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন 'ডন'-এর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮)। বস্তুত, ১৯০৫-এর শেষদিকে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই তিনি এর গোড়াপত্তন করেছিলেন 'ডন সোসাইটি'র ভাবে ও কর্মে (১৯০২-০৭)। ১৯০৬ সনের ২৫শে ফেব্রায়ারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডন সোসাইটিতে বক্তৃতাকালে সতীশবাবুর উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করেন, তাতেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হ'লে জাতীয় জীবনে সর্বাঙ্গীণ জাগরণ দেখা দেয়—আর্থিক, রাষ্ট্রিক, শিল্প-সাংস্কৃতিক সর্ব বিভাগে। ১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ জাতীয় স্বার্থে ও জাতীয় কর্তৃত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিচালনার জন্য গঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্'। ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল'। অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ আর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর প্রথম 'সুপারিন্টেনডেন্ট' বা প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর এক ইংরেজী পুস্তকে লিখেছেন ঃ "Aurobindo came to Calcutta to organise the National Council of Education and National Education in Bengal. Round him rallied men of talent and partriotism among whom special mention should be made of Satish Chandra Mookerjee of the Dawn Society" অর্থাৎ "বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ ও জাতীয় শিক্ষা সংগঠনের জন্য অরবিন্দ কলিকাতায় এলেন। তাঁকে ঘিরে অনেক স্বদেশপ্রাণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি জড় হলেন; তাঁদের মধ্যে ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"[১]। হেমেন্দ্রবাবুর এই উক্তি বিভ্রান্তিকর। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ সংগঠনের পশ্চাতে সতীশচন্দ্রের অবদান অতুলনীয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বাংলাদেশে সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তুলবার ব্যাপারে যে কৃতিত্ব আসলে 'ডন'-এর

---

(১) *Sri Aurobindo–The Prophet of Patriotism* (Calcutta, 1949, pp. 9-10)

সতীশচন্দ্রের প্রাপ্য এবং সেই সঙ্গে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী ঘোষেরও প্রাপ্য, তা হেমেন্দ্রবাবু বিনা প্রমাণে অরবিন্দের উপর আরোপ করেছেন। স্বভাবতই ইতিহাসের বিচারে এ অভিমত গ্রাহ্য হতে পারে না।[২]

১৯০৬ সনে কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে যোগদানের পূর্বে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা স্টেট কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মাসিক বেতন ছিল ৭৫০্ টাকা। ১৮৯৩ সনে বিলাত থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে অরবিন্দ বরোদায় ঐ চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সনের জুলাই পর্যন্ত তিনি বরোদার চাকুরীতে বহাল ছিলেন। ১৮৯৩-৯৪ সনে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রে প্রকাশ করেন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লেখেন। অরবিন্দের লেখালেখির ফলে বরোদা ভারত সরকারের কড়া নজরে পতিত হয়। তবে গাইকোয়াড়ের তেজস্বিতায় তখন পর্যন্ত কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বরোদার বিরুদ্ধে গৃহীত হয়নি। এদিকে অরবিন্দও পাছে তাঁর রাজনৈতিক লেখালেখির দ্বারা গাইকোয়াড়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এই মনে করে বিব্রত বোধ কবছিলেন।

১৯০৫-সনের ৭ই আগষ্ট থেকে স্বদেশী আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো। রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার অনুকূল সময় সমাগত মনে করে অরবিন্দ বরোদার চাকুরী ছেড়ে কলিকাতায় আসবার সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৯০৫-এর ১৪ই নভেম্বর ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় "বয়কট" করার জন্য ফতোয়া জারি করলেন। ১৬ই নভেম্বর পার্ক স্ট্রীটস্থ 'বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশানে'র সভায় বাংলার সম্মিলিত নেতারা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করেন, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন এম,এ, ইত্যাদি পরীক্ষা "বয়কট" করার পূর্ববর্তী ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়। ঐ দিনের সভায় বারো ঘন্টা ধরে নেতারা জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত নেতাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গিরীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল

(২) বর্তমান লেখকদের *A Phase of the Swadeshi Movement (Calcutta, 1953)* গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকাটিও এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। ঐস্থলে তাঁর পূর্ব মতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও সুবোধচন্দ্র মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫-এর ১৭ই নভেম্বরের *Bengalee* পত্রিকায় যে-সমস্ত নেতাদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে অরবিন্দের নাম ছিল না। বস্তুত, অরবিন্দ তখন পর্যন্ত বরোদায়।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পর অরবিন্দকে প্রথম কলিকাতায় দেখা যায় ১৯০৬ সনের গোড়ার দিকে। এই সময় তিনি ছুটিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। ১১ই মার্চ, ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্'। এই পরিষদের সভ্যসংখ্যা প্রথমে ছিল বিরানব্বই। উক্ত সভায় অরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তালিকাভুক্ত সদস্যদের নাম ঘোষণাকালে অরবিন্দের নামও সসম্মানে উল্লিখিত হয়েছিল। ১৯০৬ সনের মার্চ মাসের 'ডন' পত্রিকায় এই সকল তথ্য বিশদ্‌ভাবে পরিবেশিত আছে। এই সময় অরবিন্দের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের দীর্ঘ আলোচনা হয়। বরোদার সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষায় অংশ গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করলে সতীশচন্দ্র বিশেষ প্রীত হন এবং তাঁর কাছে ভাবী ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রস্তাব করেন। অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে অনিচ্ছা না থাকলেও অরবিন্দ কাজের বদলে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করেন। অবশেষে সতীশবাবুর পীড়াপীড়িতে ও যুক্তি-তর্কে মাত্র ৭৫্ টাকা মাসিক বেতন নিতে রাজি হন। অরবিন্দের এই স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগস্বীকারের সংকল্প দেখে সতীশবাবু বিশেষ মুগ্ধ হলেন; কিন্তু এই নামমাত্র অর্থে কোনক্রমেই অরবিন্দের মাসিক খরচ চলবে না উপলব্ধি করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ১৫০্ টাকা মাসিক পারিশ্রমিক গ্রহণে সম্মত করান। অরবিন্দকে অধ্যক্ষের পদে নিয়োগের পশ্চাতে সতীশচন্দ্রের প্রচেষ্টা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক হারাণচন্দ্র চাকলাদার এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও কথাপ্রসঙ্গে বর্তমান লেখকদের নিকট উপরি-উক্ত অভিমতই প্রকাশ করেছেন। সতীশচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হবার কিছুদিন পর অরবিন্দ পুনরায় বরোদায় ফিরে যান। এরপর অরবিন্দকে আবার উপস্থিত দেখতে পাই বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৪-১৫ এপ্রিল, ১৯০৬)। জুলাই মাসেই আবার অরবিন্দ বরোদা থেকে বিনা বেতনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি নিয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ও জাতীয় আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।[৩] শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন যে, ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায়

(৩) K.R. Srinivas Iyengar : *Sri Aurobindo* (Calcutta, 1945, p. 129).

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে অরবিন্দ বরোদার চাকুরীতে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন।

'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের' কাজকর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯০৬ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ও অরবিন্দের সহকর্মী রাধাকুমুদবাবু বলেন ঃ "কলেজের সঙ্গে অরবিন্দের নাম জড়িত থাকায় লোকচক্ষে কলেজের মর্যাদা বেড়েছিল অনেকখানি। তিনি সাধারণত দু'ঘণ্টা করে দৈনিক কলেজে ক্লাস নিতেন। অন্যান্য সকল কাজই সতীশবাবুকে প্রধানত দেখাশুনা করতে হতো।" বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের এ্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেণ্ট ও অরবিন্দের সহকর্মী অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার বলেন ঃ "অরবিন্দ ক্লাস নিতেও কলেজে ঠিক সময় নিয়মিতভাবে আস্‌তেন না। সতীশবাবু ও মনোমোহন ভট্টাচার্য প্রায়ই তাঁকে ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারস্থিত সুবোধ মল্লিকের বাসা থেকে ডেকে আনতেন। পক্ষান্তরে কলেজের সকল কাজকর্মে,—যেমন জাতীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনায়, অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে, ছাত্রসংগ্রহের কাজে, শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বে সর্ববিষয়েই,—সতীশবাবু ছিলেন প্রধান কর্মী। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ সহযোগী ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন দত্ত ইত্যাদি। National College-এর organisation-এ অরবিন্দের কৃতিত্ব এঁদের তুলনায় গৌণ।" এই সময় কলেজের কাজকর্মে সতীশচন্দ্রকে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হতো যে, তিনি অনেকদিন বহুবাজারস্থিত কলেজ থেকে ৩৮/২নং শিবনারায়ণ দাস লেনের বাসায়ও ফিরবার ফুরসৎ পেতেন না। এমন অনেকদিন গিয়েছে যখন সতীশবাবু সারা দিনরাত কলেজেই কাটিয়েছেন। খাট্‌তে খাট্‌তে নিতান্ত পরিশ্রান্ত যখন বোধ করতেন, তখন বহুবাজার থেকে সামান্য একটু ছানা আনিয়ে খেতেন—ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রামের কাজ সেরে নিতেন। রাত্রিতে কখনও কখনও কলেজের টেবিলের উপর চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজকে দাঁড় করাবার জন্য এই সময় (১৯০৬-০৮) সতীশবাবু যে অসামান্য পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করেছিলেন, একালের অনেকেই সে বিষয়ে অবগত নন। কিন্তু স্বয়ং অরবিন্দ ১৯০৮ সনের ১৯শে জানুয়ারি বম্বে-তে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "I spoke to you the other day about National Education and I spoke of a man who had given his life to that work, the man who really organized the National College in Calcutta, and that man also is a disciple of a Sannyasin, that

man also, though he lives in the world, lives like a Sannyasin."।[৪] জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ সংগঠনের ইতিহাসে সতীশচন্দ্র ছিলেন প্রাণস্বরূপ। প্রত্যক্ষদর্শী বিনয়কুমার সরকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ১৯০৫-০৬ সনের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস বস্তুত সতীশচন্দ্রেরই জীবনেতিহাস ("virtually the biography of Satis Mukherjee")। বিনয়বাবু লিখেছেন ঃ "It was almost exclusively by him that the burden of moulding the new ideology into a concrete pattern was shouldered."[৫] স্বদেশীযুগের অন্যতম কর্মী শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় তাঁর এক রচনায়— "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গঠনতন্ত্র' কি অরবিন্দের রচিত ?" শীর্ষক এক চিঠিতে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই জুন, ১৯৫১) সতীশচন্দ্রের অবদান সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

এদিকে ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসেই আবার বিপিন পালের সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরেই অরবিন্দ ঘোষ এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন ও পত্রিকার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসে ২/১ ক্রীক্ রো-তে সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। এই সময় সতীশবাবু অরবিন্দকে পরামর্শ দেন যে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। দেশমাতৃকার পূজার আয়োজন যেখানে, সেখানে সেবকের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নাম প্রকাশ বা প্রচার করা অসমীচীন। নাম প্রকাশ ও নাম প্রচার করতে আরম্ভ করলে সেবার আদর্শ ব্যাহত হতে পারে,—এইরূপ অভিমত সতীশচন্দ্র পোষণ করতেন। তাঁর এই পরামর্শ অরবিন্দ বিশেষ পছন্দ করেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় সম্পাদকের নাম না থাকার পশ্চাতে এই নৈতিক কারণের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণও স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার্য।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার অফিস্ ক্রীক্ রো-তে স্থানান্তরিত হবার পর থেকে বাস্তবিকই এই পত্রিকায় সম্পাদকের নাম ছাপা হতো না। এই পত্রিকা প্রত্যহ প্রত্যুষে ৩৮/২ নং শিবনারায়ণ দাস লেনে সতীশবাবুর নিকট এক কপি করে আস্তো। প্রত্যহই সতীশচন্দ্রের ছাত্র ও উক্ত মেসের ম্যানেজার সতীশচন্দ্র গুহ পত্রিকাখানি আসামাত্র বড়বাবুর (সতীশ মুখোপাধ্যায়ের) হাতে পৌঁছে দিতেন।

(৪) Sri Aurobindo : *Speeches* (Calcutta, 1948, p.15)

(৫) Benoy Kumar Sarkar : *Education for Industrialization* (Calcutta, 1946, p-75)

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন অরবিন্দের নাম পত্রিকায় ছাপা হয়। সতীশ গুহ সেদিন প্রত্যুষে বড়বাবুর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করলে তিনি চমকিত হন। পত্রিকাখানি ভাঁজ করে কোটের লম্বা পকেটে ঢুকিয়ে সতীশচন্দ্র অল্পক্ষণ পরেই ট্রামযোগে অরবিন্দের বাসা অভিমুখে রওনা হন; ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থিত সুবোধ মল্লিকের বাসায় গিয়ে একেবারে হাজির। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশের কথা বলতেই অরবিন্দও বিস্মিত হন—কারণ, ঐ দিনের পত্রিকার বিশেষত্বটুকু তখনও তাঁর নজরে পড়েনি। তখনও তাঁর চা-খাওয়া পর্যন্ত বাকি। এ-অবস্থায়ই অরবিন্দ সতীশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ক্রীক্ রো-তে অবস্থিত পত্রিকা অফিসে গিয়ে উপস্থিত। যে সমস্ত কাগজ তখনও বিলি হয়নি, সেগুলি যাতে বাইরে পাঠানো না হয় তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পর অরবিন্দ সম্পাদকের নাম তুলে ফেলে নূতন করে ঐ দিনের সংখ্যা ছাপাতে নির্দেশ দেন। অতঃপর কর্মচারীদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ঐ প্রকার 'অপকর্ম' করেছে তার খোঁজ নেন। দোষী ব্যক্তি কে বুঝতে পেরেও অরবিন্দ প্রকাশ্যে কাউকে বকাবকি করেননি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মতে দোষী ব্যক্তি ছিলেন উগ্র অরবিন্দ-ভক্ত যোগেন্দ্র কৃষ্ণ বসু।[৬]

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে সতীশচন্দ্রের যে গভীর আত্মিক সংযোগ ছিল পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি তা স্পষ্টভাবেই সূচিত করে। অরবিন্দ ছাড়া 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গেও সতীশবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই পত্রিকায় সতীশবাবুও মাঝে মাঝে লিখতেন। কাশীবাসী 'ইন্ডিয়ানা' পত্রিকার সম্পাদক ও শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের ভূতপূর্ব কিউরেটর সতীশচন্দ্র গুহ বলেন ঃ "অন্ততঃ একবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমি সতীশবাবুর লেখা দু'টো articles সুবোধ মল্লিকের বাসায় অরবিন্দের হাতে স্বহস্তে দিয়ে এসেছি। সে দু'টো রচনাই যথাসময়ে 'বন্দেমাতরম্' পত্রে ছাপা হয়"।

কঠিন পরিশ্রমে অরবিন্দের স্বাস্থ্য খারাপ হ'লে সতীশবাবু প্রভৃতি তাঁকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতার বাইরে কোথাও বায়ু-পরিবর্তনে যেতে পরামর্শ দেন। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর *Sri Aurobindo* পুস্তকে ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ১৯০৬-এর ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৭ সনের এপ্রিল মাসের মধ্যে অরবিন্দ ঘন ঘন কলেজ থেকে ছুটি নেন ও প্রায় চার-পাঁচ মাস দেওঘরে অতিবাহিত করেন। অবশ্য ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তিনি কয়েকদিন এখানে অবস্থান করেছিলেন। অরবিন্দের অনুপস্থিতিকালে

---

(৬) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত "কংগ্রেস" (কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩৫, পৃঃ ১৭৬)

(ডিসেম্বর, ১৯০৬—এপ্রিল, ১৯০৭) সতীশবাবু 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় কতকগুলি "সম্পাদকীয়" লেখেন। সতীশ গুহ কয়েকবার নিজ হাতে বড়বাবুর (সতীশ মুখোপাধ্যায়ের) রচনা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বড়বাবু নিজেও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর হাতে কয়েকবার লেখা দিয়ে এসেছেন। সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (যিনি "বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি) বলেন যে, অরবিন্দ ঘোষ 'দ্য নিউ থট্' ('The New Thought') নামে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা প্রবন্ধ (এপ্রিল-মে, ১৯০৭) 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। প্রায় সবগুলিই ছিল অরবিন্দের লেখা। তবে ঐ সিরিজ-এ সতীশবাবুরও একটা লেখা বের হয়েছিল আর সেটা হচ্ছে সিরিজের সর্বপ্রথম লেখাটি। সতীশবাবুর রচনা অরবিন্দ খুব পছন্দ করেছিলেন।

দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' কয়েক মাস চলবার পর ঐ পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকে। 'ডন'-এর ম্যানেজার সতীশ গুহ তার গ্রাহক ছিলেন। তিনি বলেন ঃ "সাপ্তাহিক সংস্করণের বাৎসরিক চাঁদা ছিল মাত্র তিন টাকা। সমস্ত সপ্তাহে 'দৈনিক বন্দেমাতরমে' প্রকাশিত লীডিং এডিটোরিয়্যালগুলি সাপ্তাহিক সংস্করণে স্থান পেতো। দৈনিকে প্রকাশিত সতীশবাবুর রচনাও সাপ্তাহিক সংস্করণে প্রকাশিত হতে দেখেছি।"

১৯০৬ সনের ১৫ই আগস্ট থেকে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের কাজকর্ম শুরু হয়। ১৯০৭ সনের জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সময় তিনি নাশন্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সে সময়েই আবার তিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার কাজে অতি-বেশি ব্যস্ত। এই দুই কাজের ঝুঁকি যুগপৎ গ্রহণ করায় ও 'বন্দেমাতরমে'র দিকে ভারসাম্য বেশি থাকায় অরবিন্দ কলিকাতায় থাকাকালীনও নিয়মিতভাবে কলেজে আসতে পারতেন না, বা এলেও সব সময় কলেজের সমস্যাসমূহে যথাযথ মনোযোগ দিতে পারতেন না। নামে অধ্যক্ষ থাকলেও আসল কর্ম-পরিচালনার মূল দায়িত্ব এসে পড়েছিল সতীশচন্দ্রের উপর। সাধারণত কলেজে অধ্যক্ষের যে সমস্ত administrative functions থাকে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে সেগুলি ছিল সুপারিন্টেনডেন্ট সতীশচন্দ্রের উপর। সুপারিন্টেনডেন্ট-এর ক্ষমতা ছিল অতি-বিস্তৃত। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার *Sri Aurobindo* পুস্তকের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "Presently, however, he left the organisation of the College to the educationist

Satish Mukherjee, and plunged fully into politics." অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার বর্নিত ঘটনাবলীর সঙ্গে উদ্ধৃত উক্তির যথেষ্ট মিল আছে।

১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাস। কলিকাতায় তখন কংগ্রেসের অধিবেশন চল্‌ছে (২৬—২৯শে ডিসেম্বর)। ঐ কংগ্রেসে তিলক, লাজপত রায়, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতারা অংশ গ্রহণ করেছেন। সতীশ মুখোপাধ্যায়ও এই্ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। এই্ সময়েই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মর্ডান রিভিয়ু' পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৭ সনের জানুয়ারি থেকে এর প্রথম সংখ্যা শুরু হয়। কিন্তু কয়েক দিন পূর্বেই ডিসেম্বরের শেষাশেষি প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল এবং রামানন্দবাবু নিজেও কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।[৭] তখন এলাহাবাদ থেকে "মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশিত হতো।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হবার পরে অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেও লোকমান্য তিলক কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন। সে সময় তিনি একদিন,—খুব সম্ভবত জানুয়ারি, ১৯০৭ সনে,—বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন। নির্দিষ্ট দিনে সকাল ৭টার সময় কলেজের কাজ শুরু হয়। ৮টায় সময় তিলকের আসবার কথা। অরিবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য সকলেই্ প্রায় ঐদিন কলেজে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার তিলকের শুভাগমন উপলক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ সম্ভাষণ প্রদান করেন। কলেজের কাজকর্ম পরিদর্শনের পর অধ্যক্ষ অরবিন্দের সঙ্গে তিলকের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। তিলকের ধারণা ছিল যে, অরবিন্দ যুগপৎ ন্যাশন্যাল কলেজ ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। উভয়ের গুরুদায়িত্ব যুগপৎ কী করে সুষ্ঠুভাবে অরবিন্দ পালন করেন, — তিলকের এরূপ প্রশ্নের উত্তরে অরবিন্দ বলেন যে, সহকর্মীদের সাহায্যের ফলে তাঁর কাজের বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না। তিলক এই্ প্রসঙ্গে অরবিন্দকে যে কোনো একটা কাজের,—হয় 'বন্দেমাতরম্' না হয় ন্যাশন্যাল কলেজের,—মূল দায়িত্ব গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। অন্য কাজে তিনি সাহায্যকারী থাকতে পারেন, কিন্তু মূল দায়িত্ব থাকবে অপরের। কারণ দু'-দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব একজনের উপর ন্যস্ত থাক্‌লে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে পালন করা কঠিন। অরবিন্দ তিলককে অগ্রজতুল্য জ্ঞান করতেন ও তাঁর পরামর্শের ফলে ন্যাশন্যাল কলেজে পদত্যাগ করে 'বন্দেমাতরম'-এর দিকে সমগ্র নজর দেবার সংকল্প নেন। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবিষয়ে কথাবার্তা হ'লে তিনি অরবিন্দকে পদত্যাগ করতে বারণ করেন। সতীশবাবুর

(৭) শান্তা দেবী প্রণীত "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাঙ্গলা" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

অনুরোধে অরবিন্দ পদত্যাগ করার ইচ্ছা স্থগিত রাখেন। কিন্তু তা সাময়িক। ১৯০৭ সনের আগষ্ট মাসে অরবিন্দ রাজনৈতিক কারণবশত কলেজের অধ্যক্ষ-পদে ইস্তফা দেন। সতীশবাবুকে সে সময় অরবিন্দ বলেছিলেন যে, 'বন্দেমাতরমে' লেখা-লেখি নিয়ে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, তাতে যে কোনোদিন তাঁকে জেলে যেতে হতে পারে, এবং তাঁর সংশ্রব থাকার ফলে কলেজের ক্ষতিও হতে পারে।[৮] এর পরই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তাঁর পদত্যাগের তারিখ হলো ২রা আগষ্ট, ১৯০৭। এই সময় থেকে সতীশবাবু আবার 'অধ্যক্ষে'র পদেও অধিষ্ঠিত হন।

১৬ই আগষ্ট, ১৯০৭ সনে অরবিন্দের নামে 'বন্দেমাতরমে' আপত্তিজনক লেখা প্রকাশের অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (warrant) বের হয়। ওয়ারেন্ট হাতে পৌঁছুবার আগেই অরবিন্দ স্বেচ্ছায় থানায় গিয়ে নিজেকে ধরা দেন। অরবিন্দের নিজে ধরা দেওয়ার সংবাদ কলেজে পৌঁছুবামাত্রই ছাত্র-শিক্ষক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঐদিন কলেজে এক সভা আহূত হয়। বক্তা একমাত্র সতীশচন্দ্র। তিনি সামনে একটা বড় টেবিলের উপর ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি সংক্রান্ত কয়েকখানা বই এনে রেখেছেন। সেদিন অন্ততঃ দুই ঘন্টাব্যাপী সতীশবাবু বাংলায় কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্মুখে অরবিন্দ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, তাদের জীবন ধন্য কারণ তারা অরবিন্দের মতো দেশভক্ত, স্বার্থত্যাগী মানুষের সংস্পর্শে আসতে পেরেছে। স্বার্থত্যাগ ও দেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ অরবিন্দকে তিনি মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ইত্যাদি কর্মবীরের সঙ্গে তুলনা করেন। ইতালীর গুপ্ত সমিতি বা 'কারবোনারি'র কাজকর্মের সঙ্গে অরবিন্দের গোপন রাজনৈতিক কাজকর্মের মিল কতখানি সে বিষয়ে সতীশবাবু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সতীশবাবুর ঐ বক্তৃতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অরবিন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যে কত গভীর, কলেজের ছাত্ররা সেদিন প্রকাশ্যে তার পরিচয় পায়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে অরবিন্দ থানায় গিয়ে নিজেকে ধরা দেবার পর গিরীশচন্দ্র বসু ও নীরোদচন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয় জামিন হয়ে অরবিন্দকে খালাস করে আনেন।

২২শে আগষ্ট, ১৯০৭ সনে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলে অরবিন্দকে যে বিদায়-অভিনন্দন দিয়েছিলেন, তার বিবরণ "An Interest-

---

(৮) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'কংগ্রেস' পুস্তকে লিখেছেন যে, ১৯০৭ সনের ৮ই জুন 'বন্দেমাতরমে'র সম্পাদককে সরকার এক পত্রে সতর্ক করে দেয় ও লেখে : 'warning him for using language which is a direct incentive to violence and lawlessness'। জুলাই মাস থেকে সংবাদপত্র দলনের ধুম পড়ে। ৩০শে জুলাই 'বন্দেমাতরম্' কার্যালয়ে থানাতল্লাস হয়।

ing Ceremony at the Bengal National College" নামে 'ডন' পত্রিকায় ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ২৩শে আগষ্ট পুনরায় অরবিন্দকে কলেজে আমন্ত্রণ করা হয় ফটো তোলার উদ্দেশ্যে। ঐদিন দু'টি ফটো তোলা হয়েছিল। মাল্যভূষিত অবস্থায় অরবিন্দের স্বতন্ত্র ফটো তোলার পর কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রসমেত আর একটা 'গ্রুপ ফটো' তোলা হয়। এই ফটোতে অরবিন্দের বাঁ দিকে (অবশ্য দু-একজনের পরে) সতীশবাবু উপবিষ্ট ছিলেন। এক তলায় 'গ্রুপ ফটো' তোলার সময় দোতলায় রেলিং-এর কাছে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁর ফটোও ঐ অবস্থায় 'গ্রুপ ফটো'তে উঠেছিল।

এরপর কলেজের ছাত্ররা অরবিন্দকে হিন্দুরীতিতে জলযোগে আপ্যায়িত করে। তাদের উদ্দেশ্যে ঐদিন (২৩শে আগষ্ট, ১৯০৭) অরবিন্দ যে মর্মস্পর্শী বিদায়-অভিভাষণ প্রদান করেন, তার সারাংশটুকু রাধাকুমুদবাবুর উৎসাহে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক অনুলিখিত হয়। এই অনুলিখন এত নির্ভুল ও সঠিক ছিল যে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায়ই অরবিন্দ ঐ রচনা অনুমোদন করেন এবং তা ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসের 'ডন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতা "Advice to National College Students" নামে শ্রীঅরবিন্দের *Speeches* পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশকগণ ঐ বক্তৃতার তারিখ হিসাবে ২২শে আগষ্ট, ১৯০৭ সন উল্লেখ করেছেন। তথ্যটা ভুল। ঐ বক্তৃতা অরবিন্দ ২৩শে আগষ্ট প্রদান করেছিলেন। ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বক্তৃতায় অরবিন্দ বলেছিলেন ঃ "There are times in a nation's history when Providence places before it one work, one aim, to which everything else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. Such a time has now arrived for our mother-land when nothing is dearer than her service, when everything else is to be directed to that end ..... Work that she may prosper. Suffer that she may rejoice. All is contained in that one single advice." অর্থাৎ "প্রত্যেক জাতির জীবনে এমন সময় আসে যখন ভগবান তার সম্মুখে উপস্থিত করেন একটিমাত্র কর্ম, একটিমাত্র লক্ষ্য যার পাশে আর সবকিছুই হয়ে যায় তুচ্ছ। আমাদের দেশজননীর সামনে এই রকমই একটি সময় এসে উপস্থিত হয়েছে যখন দেশসেবার থেকে অন্য কোনো কিছুই মহত্তর বিবেচিত হতে পারে না, যখন অন্যান্য সব কিছুকেই ঐ আদর্শের লক্ষ্যাভিমুখীন করতে হবে। ..... তোমরা এমনভাবে কাজ করে যাও যাতে দেশ-জননীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। দুঃখ বরণ

করো যাতে তাঁর আত্মা পরিতৃপ্তা হন। এই একটিমাত্র উপদেশের মধ্যেই আমার বলার সব কিছু ধরা থাকলো।" এই প্রসঙ্গে হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের "জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে প্রদত্ত (২৫ নভেম্বর, ২০০১) ভাষণটি "রবিসন্ধ্যা" ত্রৈমাসিকের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (মার্চ, ২০০২) দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, অরবিন্দের দেশসেবা, স্বার্থত্যাগ ও বিদ্যাবত্তার প্রতি সতীশবাবু গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তাঁর বিপ্লবাত্মক কর্মনীতিতে বা 'বোমার দর্শনে' সতীশচন্দ্রের নৈতিক সমর্থন ছিল না। তিনি তাঁর নিকটতম ছাত্র-শিষ্যদের,— যেমন সতীশ গুহ, কৃষ্ণদাস সিংহ রায় ইত্যাদিকে, —বলতেন ঃ "গোঁসাই (অর্থাৎ আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) আমাকে বলেছেন যে হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা নয়।" যে অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের দর্শন মহাত্মা গান্ধী পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রচার ও প্রয়োগ করেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গি সতীশবাবু স্বদেশী যুগে পোষণ করতেন ও সর্বদা সাত্ত্বিকভাবে আন্দোলন করার উপর জোর দিতেন। মূলকথা এই যে, সন্ত্রাসবাদ বা terrorism-এর পক্ষপাতী সতীশবাবু কোন দিনই ছিলেন না। এ কারণেই শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন যে, "অরবিন্দ, সতীশ মুখোপাধ্যায় হইতে পৃথক"।[৯]

একটি ঘটনার দ্বারা এ বিষয়টা আরও পরিস্কারভাবে বুঝানো যেতে পারে। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক। সতীশ গুহ সংস্কৃত ক্লাসে তাঁর ছাত্র। তিনি সতীশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ৩৮/২ নং শিবনারায়ণ দাস লেনের মেসে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, রবি ঘোষ ইত্যাদির সঙ্গে একত্রে থাকতেন। সামাধ্যায়ী মহাশয় ছিলেন একজন 'টেররিষ্ট'। তিনি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে শিবনারায়ণ দাস লেনেরই আর এক বাড়িতে,— যে বাড়ীর একতলায় 'ফিল্ড্ অ্যান্ড অ্যাকাডেমী ক্লাব' ছিল তার দোতলায় থাকতেন[১০] ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় লিখতেন।

১৯০৭ সনের কথা। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে একটা প্রবল উত্তেজনা জেগে উঠেছে। সামাধ্যায়ী সন্ত্রাসবাদের পুরাদস্তুর সমর্থক। সতীশবাবু সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে। সতীশবাবুকে সন্ত্রাসবাদের দলে টানবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি একদিন

---

* (৯) 'উদ্বোধন', পৌষ, ১৩৫০, পৃঃ ৫৪৮

* (১০) "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ২৮৪-২৮৮) দ্রষ্টব্য।

সকালে শিবনারায়ণ দাস লেনের বাসা থেকে সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে মানিকতলার under-ground bomb factory তে হাজির। Factory র বিভিন্ন কাজকর্ম সতীশবাবুকে দেখানোর পর সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে সামাধ্যায়ী মহাশয় বেশ কিছু ওকালতি করেন ও সতীশবাবুকে তাদের দলে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সতীশবাবুর নীরবতায় চঞ্চল হয়ে সামাধ্যায়ী মহাশয় উত্তেজিতভাবে তাঁকে বলেন ঃ "আপনি আমাদের terrorism সমর্থন না করলে আপনাকে এখান থেকে ছাড়বো না।" সামাধ্যায়ী জানতেন সতীশবাবু দৃঢ় চরিত্রের লোক — সত্যনিষ্ঠা তাঁর মজ্জাগত। একবার তিনি প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করবার লোক সতীশবাবু নন। জোরজবরদস্তি করে সতীশবাবুর কাছ থেকে সন্ত্রাসবাদ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য সেদিন সামাধ্যায়ী বিশেষ চেষ্টা করেন। সামাধ্যায়ীর উত্তেজিত অবস্থা দেখে সতীশবাবু চিন্তিত হয়ে পড়েন ও শেষ পর্যন্ত তিনি সামাধ্যায়ীকে বলেন ঃ "একদিন অন্ততঃ ভেবে দেখবার সময় দিন"। কোন প্রকারে সামাধ্যায়ীকে শান্ত করে তিনি সেদিন বাড়ী ফিরে আসেন। সামাধ্যায়ী ফিরবার সময় সতীশবাবুকে বলেন যে, কাল তিনি সতীশবাবুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনতে সকাল আটটায় তাঁর মেসে আবার আসবেন।

সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে জোরজবরদস্তি করে তাঁকে টান্‌বার জন্য সামাধ্যায়ীর আগ্রহাতিশয্য দেখে সতীশবাবু বাস্তবিকই প্রমাদ গুণলেন। পরদিন সকালে সামাধ্যায়ী আবার আসবেন। সন্ত্রাসবাদ সমর্থন না করলে হয়ত ঝোঁকের মাথায় তিনি একটা কাণ্ড করে বসতে পারেন। এই সব সাত পাঁচ ভেবে সেইদিনই সতীশবাবু ১২্ মাসিক বেতনে এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান নিযুক্ত করেন ও তাকে নির্দেশ দেন স্লিপ ছাড়া বাইরের কাউকে যেন বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে দেওয়া না হয়। হিন্দুস্থানী দারোয়ান-নিয়োগের এই আকস্মিক ঘটনায় সতীশবাবুর সহবাসীরা, — যেমন সতীশ গুহ ইত্যাদি ব্যক্তিরা, — আশ্চর্যান্বিত হন।

পরদিন সকালে মোক্ষদা সামাধ্যায়ী যথাসময়ে এসে উপস্থিত। সতীশবাবুর নির্দেশে সেদিন দারোয়ান তাঁকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। দোতলার বারান্দা থেকে সতীশবাবু সামাধ্যায়ীকে বলেন যে, ওকাজ তাঁর দ্বারা হবে না। সতীশবাবু সেদিন কোনক্রমেই নীচে এসে সামাধ্যায়ীর সঙ্গে দেখা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। সতীশবাবুর উত্তর শুনে সামাধ্যায়ী চটে যান এবং রাস্তা থেকে তাঁর উদ্দেশে গালি বর্ষণ করে প্রস্থান করেন। সতীশবাবুর প্রতি সামাধ্যায়ীর এই অদ্ভুত আচরণে কৃষ্ণদাস সিংহ রায়, সতীশ গুহ ইত্যাদি মেসের অধিবাসীরা খুব বিস্মিত হন। এই

ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে তাঁরা সতীশবাবুর কাছ থেকে উক্ত ঘটনার গূঢ় কারণ জানতে পারেন।

ঐ ঘটনায় সন্ত্রাসবাদের উপর সতীশবাবুর বিতৃষ্ণা বাড়ে বই কমেনি। সতীশবাবুর সঙ্গে শিবনারায়ণ দাস লেনের মেসে যে সমস্ত ছাত্ররা থাকতেন তাঁদের মধ্যেও কাউকে কাউকে সন্ত্রাসবাদের সমর্থক মনে করে সতীশবাবু ঐ মেস থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেন। এই সব ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস সিংহ রায় (যিনি পরবর্তীকালে গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছিলেন, তিনি) ছিলেন অন্যতম। এই সমস্ত ঘটনা ১৯০৭ সনের অন্তর্ভুক্ত।

১৯০৮ সনের মে মাসে অরবিন্দ ঘোষ বোমার মামলায় জড়িত হবার পর চারিদিকে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাস ও ধরপাকড় হতে থাকে। আলিপুর সেশান্স্ কোর্টে বিচারের সময় অরবিন্দের মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্য সতীশচন্দ্রেরও ডাক পড়ে। কোর্টে না গেলে পাছে Contempt of Court -এর কবলে পড়তে হয় এই চিন্তায় সতীশবাবু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হন। সে সময় অনেক দিন সতীশবাবুকে কোর্টে যেতে হয়েছিল। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি নিয়ে সতীশবাবুর সঙ্গে হারাণ চাকলাদার মহাশয়ও যেতেন। অরবিন্দের পক্ষ-সমর্থনকারী ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তৃতায় অনেকবারই সতীশচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অরবিন্দের বোমার মামলার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের কাজকর্ম পুরাদমে চলেছিল।

সন্ত্রাসবাদের দিকে সতীশচন্দ্রের বিতৃষ্ণা ছিল অনেকদিন ধরেই। মোক্ষদা সামাধ্যায়ীর আচরণে বিশেষ করে অরবিন্দ বোমার মামলায় জড়িত হ'বার পর পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসে সতীশবাবু বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াও ছিল তাঁর নিতান্ত ইচ্ছাবিরুদ্ধ। তাছাড়া, কলেজের অনেক ছাত্রেরও সন্ত্রাসবাদের দিকে প্রবণতা তিনি লক্ষ্য করলেন। শিক্ষকদের মধ্যেও কেহ কেহ,— যেমন মোক্ষদা সামাধ্যায়ী ইত্যাদি, — ছিলেন সন্ত্রাসবাদের সমর্থক। সতীশবাবু অনুভব করলেন যে, 'সাত্ত্বিকভাবে' কাজ করা ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তদুপরি ১৯০৮ এর শেষ দিকে দীর্ঘদিনের কঠিন পরিশ্রমে তাঁর শরীরও ভগ্নপ্রায়। এই সময় তিন চার বার তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। বাল্যবন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার তাঁর শরীর পরীক্ষা করে Incipient Phthisis বলে ঘোষণা করেন ও দীর্ঘকালীন বিশ্রামের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। সতীশবাবু প্রথমে পনেরো দিনের ছুটি নেন এবং দয়ালস্বামী নামক একজন

পূর্বপরিচিত বাঙালী সাধুর নির্দেশক্রমে হরিতাল ভস্ম ও অধিক পরিমাণ গব্যঘৃত (আয়ুর্বেদীয় ঔষধ) খেতে থাকেন। দিন পনেরো এভাবে চিকিৎসাধীন থাকার পর সতীশবাবু আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন (ডিসেম্বর, ১৯০৮)। পদত্যাগের পরেও ন্যাশন্যাল কলেজের উপর সতীশবাবুর প্রভাব ছিল অসামান্য। বস্তুত, তাঁর ইচ্ছায় ও সমর্থনেই চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৯ সনের মে মাসের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পদত্যাগের পরও সতীশবাবু কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন।

১৯১০ সনের প্রথম দিকে অরবিন্দ উত্তর কলিকাতা থেকে (বাগবাজারের গঙ্গা ঘাট থেকে) নৌকাযোগে চন্দননগর পলায়ন করেন। ঐ দিন যাওয়ার সময় উত্তর কলিকাতার পথে ঘটনাচক্রে সতীশবাবুর সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। সেদিন অরবিন্দ সতীশবাবুর সঙ্গে কোন কথাই বলেননি। কেবল ঘাড় ফিরিয়ে কয়েক সেকেন্ড সতীশবাবুর দিকে তাকিয়ে নিজ পথে চলে যান। সতীশবাবু পরে তাঁর ছাত্রদের বলেছিলেন যে, অরবিন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছে অথচ কথা হয়নি এরকম দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে আর কখনও ঘটেনি। পাছে কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে যায় এবং পাছে দেরি হ'লে কোন অঘটন ঘটে, সম্ভবত এই আশঙ্কাতেই অরবিন্দ সেদিন কোন কথা বলতে চাননি। কলিকাতা পরিত্যাগের পর অরবিন্দের সঙ্গে সতীশবাবুর আর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। চন্দননগরে অরবিন্দ "প্রবর্তক" সংঘের মতিলাল রায়ের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন (১৬ই ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯১০)। মাস দেড়েক চন্দননগরে পলাতকের জীবনযাপনের পর এপ্রিল মাসের একেবারে গোড়ার দিকে অরবিন্দ ছদ্মনামে দুপ্লে জাহাজে চেপে পন্ডিচেরিতে স্থায়ীভাবে আশ্রয় নেন। এ বিষয়ের উপর বিস্তৃত আলোচনা লেখকদ্বয়ের *Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics* (1997) গ্রন্থের ৩৫৬-৭৫ পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট আছে। উমা মুখোপাধ্যায়ের *Two Great Indian Revolutionaries (1966)* গ্রন্থখানির ৩৯-৪১ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

সতীশচন্দ্রের শেষ জীবন

॥ ১ ॥

ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় শিক্ষার জনক আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবন-মধ্যাহ্ন ছিল যেমনই কর্মমুখর, জীবন-সায়াহ্ন তেমনি বহির্মুখী কর্ম থেকে নির্লিপ্ত। শেষ জীবনে ধর্মই ছিল তাঁর মূলীভূত বিষয়। অন্যান্য সকল কর্মই আনুষঙ্গিক মাত্র। এই যুগে তিনি মোটের উপর ছিলেন প্রবাসী —কাশীবাসী।

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাংলার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান পুরোধা হিসাবে সতীশচন্দ্র দন্ডায়মান ছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার কাজে তাঁকে যে অমানুষিক পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল তাতে তাঁর শরীর প্রায় ভেঙে যায়। ১৯০৮ সনের শেষাশেষি তাঁর গলা দিয়ে রক্ত ওঠে। ঐ সময় নিদারুণ শারীরিক অসুস্থতায় তিনি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধায়কের পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। বিশ্রাম ও সুচিকিৎসায় তাঁর হারাণো শক্তি ও কর্মস্পৃহা আবার কিছু দিনের মধ্যেই ফিরে এলো। কর্মযোগী সতীশচন্দ্র আবার কর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি হলো 'ডন' পত্রিকার সুষ্ঠু সম্পাদনা ও পরিচালনা। সকল বাহ্য কর্ম থেকে সরিয়ে এনে তিনি এই সময় নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করলেন 'ডন' এর সম্পাদনায় ও 'ডন' এর মারফৎ জাতির সেবায়। এই যুগটাকে 'ডন' পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বিবেচনা করা চলে। এই সময় তিনি শিবপুরে বাসা ভাড়া করে তাঁর কয়েকজন প্রিয় ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে জীবন কাটাতেন। এই সকল ছাত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সতীশচন্দ্র গুহ ও কৃষ্ণদাস সিংহ রায় ছিলেন। হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ও উক্ত মেসের সন্নিকটেই স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করে সপরিবারে থাকতেন। সতীশবাবুর পরিচালনায় 'ডন' পত্রিকা ১৯১৩ সনের নভেম্বর পর্যন্ত বের হয়েছিল। তারপর তিনি পুনরায় বিষম অসুস্থ হয়ে পড়েন ও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। আর্থিক অনটন বশতঃ 'ডন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়নি। আসল কারণ ছিল নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যাল্পতা ও সতীশচন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতা।

দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমে ১৯১৩ সনের শেষাশেষি সতীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। যৌবনের কর্মভূমি কলিকাতা ও বাংলাদেশ থেকে বিদায়

নিয়ে তিনি রওনা হলেন পুণ্যতীর্থ কাশীধামের উদ্দেশে। তাঁর সেবার জন্য সঙ্গে নিলেন কৃষ্ণদাসকে (যিনি পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছিলেন)। শিবপুরের আস্তানা গুটিয়ে প্রয়োজনীয় মালপত্র,—বিশেষ করে লাইব্রেরীর বইপত্র,—রেলসংযোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আর একজন ছাত্রও শীঘ্রই কাশীধামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তিনিই 'ডন' পত্রিকার ভূতপূর্ব ম্যানেজার (১৯০৭-১৯১৩) সতীশচন্দ্র গুহ বা 'ছোটবাবু'।

বারাণসীতে সতীশচন্দ্র প্রথমে আস্তানা পেতেছিলেন কাশী ষ্টেশনের সন্নিকটে ত্রিলোচন ঘাটে, তারপর হাউজ্-ক্যাটারায় তারাকিশোর রায়চৌধুরীর (যিনি এককালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন ও যিনি পরবর্তী জীবনে সন্তদাস বাবাজীরূপে বহু লোকের শ্রদ্ধাভাজন হন, তাঁর) বাড়ীতে এবং পরিশেষে ৪৭নং তেড়েনীম গলিতে। তেড়েনীম গলিতে তিনি দোতলা বাসাবাটি ভাড়া করে ঠাকুর, চাকর রেখে বসবাস করতেন। এইখানে তিনি প্রথমবার প্রায় একটানা ১৯২২ সন পর্যন্ত ছিলেন।

কাশীধামে অবস্থানকালে সতীশচন্দ্র বহির্জগতের কর্ম-কোলাহল থেকে অনেকটা নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং ধর্ম-সাধনাই এই সময় তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করলে একান্তই ভুল হবে যে, এই যুগে বুঝি সতীশবাবু চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তা কিন্তু মোটেই নয়। মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগে ১৯১৪-১৫ সনে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তোড়জোড় চলছে। নাগওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বিপুলাকার স্থানও নির্দিষ্ট হলো। নাগওয়াত ছিল শাস্ত্র-বর্ণিত কাশীধামের চৌহদ্দী বহির্ভূত। সতীশচন্দ্র এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হিন্দু সমাজের শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রাজ্ঞজনদের উদ্দেশ্যে একটি জোরালো (তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ) সার্কুলার পত্র প্রেরণ করেন তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জানবার জন্য। পত্রটির তারিখ ছিল ৬ নভেম্বর, ১৯১৫। সতীশচন্দ্রের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে সে সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বড় বড় মনীষী পত্রোত্তর দিয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র স্বাক্ষরিত (বেনারস, ৮ জানুয়ারি, ১৯১৬ সনে লিখিত) পত্রখানি থেকে এসব তথ্য জানা যায়। বর্তমানে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে দণ্ডায়মান কাশীর সেই স্থানটি নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে নিষ্কাম কর্মযোগী সতীশচন্দ্রের একটা বড় ভূমিকা ছিল। *The Origins of the National Education Movement* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (জুন, ২০০০) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৯১৬ সনে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে অনেক বাঙালী মনীষীও এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন যদুনাথ সরকার, শ্যামাচরণ দে ও জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য অবাঙালী অধ্যাপকদের মধ্যে এইচ্. এল্. চাব্লানি. এইচ্. বি. মালকানি ও জে. বি. কৃপালানির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি প্রায় নিয়মিত-ভাবেই সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চালাতেন। ১৯৫২ সনের ১৩ নভেম্বর তারিখে লিখিত এক পত্রে যদুনাথ সরকার আমাদের জানিয়েছিলেন ঃ "আমি August, 1917 হইতে June, 1919 পর্যন্ত কাশীতে কাজ করি। প্রায় প্রত্যহ তাঁহার (সতীশবাবুর) বাড়ী যাইতাম এবং নানা কথা হইত।" বস্তুত, কাশীধামে অবস্থানকালীন সতীশচন্দ্র ঐ স্থানের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও চরিত্র-মাধুর্য অনায়াসেই বহু মনীষীকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। জননায়কদের মধ্যে সেখানে বোধ হয় এমন কেহই ছিলেন না যিনি সতীশবাবুর কাছে ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে অপরিচিত। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এককালে 'ডন' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। সতীশবাবুর কাশীতে অবস্থানকালে মালব্যজী বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন ও নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাইতেন। তাছাড়া, বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ড: ভগবান দাস, আচার্য নরেন্দ্র দেব, পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ প্রমুখ প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি সতীশবাবুর বিশেষ গুণগ্রাহী হয়েছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালেই অধ্যাপক জে. বি. কৃপালানির সঙ্গে সতীশবাবুর এবং তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সতীশবাবুর ছাত্র কৃষ্ণদাস বলেন যে, সতীশবাবু তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের বইপত্র পরে কৃপালানিকে দান করেছিলেন এবং বেনারস খাদি সমিতি বা গান্ধী আশ্রম সংগঠনের ব্যাপারেও কৃপালানিকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

॥ ২ ॥

১৯১৯-২০ সনে ভারতের রাষ্ট্রিক জীবনে গান্ধী-যুগের সূচনা। ১৯১৮ সনে ভারতের রাষ্ট্রিক রঙ্গমঞ্চে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সংগ্রাম-দূত গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৯ সনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী স্থিরীকৃত হয়। এর প্রথম লক্ষ্য হলো পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান। ঐ সময়কার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবও ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভার্সাই সন্ধির চুক্তি অনুসারে তুর্কী সাম্রাজ্যকে

খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় ও সুলতান পদের অবস্থান ঘটানো হয়। তুরস্কের সুলতান ছিলেন খালিফ—মুসলিম দুনিয়ার ধর্মগুরু। খালিফের অবমাননা মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মনে এক তীব্র অসন্তোষ ও উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং তাদের সেই আহত বেদনাবোধের গর্ভে জন্ম নেয় খিলাফৎ আন্দোলন। সেই আন্দোলন ছিল প্যান-ইসলামিক আন্দোলন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও সেই আন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষকেও আঘাত করে। জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের আশায় গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি জানালেন তাঁর পূর্ণ সমর্থন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ণয়ের ব্যাপারে গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনকে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের উপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল গান্ধীর এই দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং তাঁর অর্থাৎ বিপিনচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত *India Challenge and Response* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (এপ্রিল, ২০০২) বর্তমান লেখকদের সতীশচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে রচনা দু'টি পঠিতব্য। ১৯২০ সনের শেষ দিকে গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন অসহযোগ আন্দোলন। ভারতে ইংরেজ শাসন চিহ্নিত হলো "শয়তানের শাসন" বলে। সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চললো এক নবজীবনের তরঙ্গ।

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সুজড়িত ছিল অহিংসা-দর্শন। তাঁর অহিংসা-দর্শন সতীশচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদা তাঁকে বলেছিলেন ঃ "হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা নয়।" এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ সতীশচন্দ্র স্বদেশী যুগে সর্বদাই সাত্ত্বিকভাবে আন্দোলন চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। অরবিন্দের প্রতিভা, স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রীতির প্রতি তাঁর গভীরতম শ্রদ্ধা থাকলেও, অরবিন্দ সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের দর্শন ও কর্মসূচীর প্রতি কোনদিনই তাঁর আস্থা বা সমর্থন ছিল না। এই কারণেই গান্ধীর অহিংসা-দর্শন স্বভাবতই সতীশবাবুর পূর্ণ আত্মিক সমর্থন পেয়েছিল। গান্ধী-দর্শন সমর্থন করে এই সময় সতীশবাবু একাধিক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছিলেন। গান্ধীজী-সম্পাদিত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রেও তাঁর কোন কোন রচনা প্রকাশিত হতো। এদের মধ্যে "দি সিক্রেট্ অব বাপু" নামক প্রবন্ধটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে—কী স্বদেশী যুগে, কী গান্ধী যুগে—সতীশবাবুর প্রকাশিত রচনায় ক্বচিৎ কালেভদ্রে নিজ নামের স্বাক্ষর থাকতো। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে নাম

প্রকাশ ও নাম প্রচারের সঙ্গে যথার্থ সেবার আদর্শের অন্তর্নিহিত বিরোধ রয়েছে। দেশমাতৃকার পূজার আয়োজনে সেবকের আদর্শ পূর্ণ মাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্যক্তিগত নাম প্রচার অসমীচীন। পক্ষান্তরে, গান্ধীজী এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। প্রত্যেক মুদ্রিত রচনায় লেখকের নামের স্বাক্ষর থাকা একান্ত প্রয়োজন এই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা। রচনার সঙ্গে রচয়িতার নাম প্রকাশের অর্থ হলো এই যে ঐ রচনার জন্য লেখক সকল দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে এইরূপ সৎসাহস ও চরিত্রবত্তা বিশেষ মূল্যবান। গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী এই সময় ছিলেন কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস বলেন, নাম প্রকাশের বিষয় নিয়ে সতীশবাবু ও গান্ধীজীর মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়; কিন্তু দু'জনের কেহই শেষ পর্যন্ত নিজ মত ও পথ বর্জন করেননি।

সতীশবাবুর কয়েকজন হাতে-গড়া ছাত্রও এই সময় গান্ধী দর্শনের নিষ্ঠাবান প্রচারক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯১৯-২০ সনে অসহযোগ নীতি নিয়ে দেশের ভেতরে মত-বিরোধ দেখা দেয়। ঐ সময় সতীশচন্দ্রের স্বদেশীযুগের ছাত্র কৃষ্ণদাস অসহযোগ রাজনীতি সমর্থন করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন এবং ঐগুলি মতিলাল নেহেরুর 'ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট' পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনারূপে প্রকাশিত হয়। ঐ লেখাগুলি তৎকালে বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ জে. বি. কৃপালানির নাম উল্লেখ করা চলে। কৃপালানি ইতিপূর্বেই সতীশবাবু ও কৃষ্ণদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। কৃষ্ণদাসের রচনাগুলি পড়ে কৃপালানি বিশেষ প্রীত হন ও গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। কৃষ্ণদাসকে দেখে গান্ধী খুশি হন ও তাঁর কাজে তাঁকে সহায়তা করতে বলেন। আমেদাবাদে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে কৃষ্ণদাসের সহায়তা পেলে গান্ধী খুশী হন, এই মর্মে এক সংবাদ কৃপালানি কৃষ্ণদাসকে জ্ঞাপন করেন। এর উত্তরে কৃষ্ণদাস গান্ধীজীকে বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখন বার্ধক্যের সীমায় উপনীত; তাঁর সেবাই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। গান্ধীজী তখন বলেন, প্রয়োজন হ'লে তিনি সতীশবাবুকে পত্রমারফৎ তাঁর ইচ্ছা জানাবেন। এর পর গান্ধীজী সতীশবাবুর নিকট এক পত্রও লিখেছিলেন তাঁর কাজে কৃষ্ণদাসকে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে। সেদিন সতীশবাবু নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা আদৌ চিন্তা না করে সানন্দে কৃষ্ণদাসকে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস ১৯২১-২৮ পর্যন্ত গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। ১৯২১ সনের আগষ্ট থেকে ১৯২২ সনের মার্চ

পর্যন্ত তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ পর্যটন করেন এবং ঐ সময়ে প্রাত্যহিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে কাশীবাসী সতীশবাবুকে অসংখ্য পত্র লেখেন। এই পত্রগুলিই পরে সতীশবাবুর দ্বারা সংশোধিত হয়ে সতীশবাবুর উৎসাহে *Seven Months with Mahatma Gandhi* নামক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। এর প্রথম খণ্ড বের হয়েছিল কলিকাতা থেকে ১৯২৪ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড বিহারের দিগ্ওয়ারা থেকে ১৯২৭ সনে। অসহযোগ আন্দোলনের এই সাত মাসের এমন তথ্যবহুল ও সঠিক বিবরণ আর কোথাও নেই। স্বয়ং গান্ধীজীও ১৯২৯ সনের ২৬ ডিসেম্বর তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "The volumes are the only narrative we have of the seven months with which Krishnadas deals." এর অনেকদিন পর (১৯৫১) উক্ত গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বের হয়েছিল। সম্পাদনা করেছিলেন মার্কিন পণ্ডিত রিচার্ড বি. গ্রেগ।

সতীশবাবুর ছাত্রদের মধ্যে আরও কয়েকজন এই সময় গান্ধী-দর্শন প্রচারে ব্রতী হন। উদাহরণস্বরূপ সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের নামোল্লেখ করা চলে। ১৯২২ সনে কলিকাতা থেকে তিনি "গান্ধী মাহাত্ম্য" নামে এক সংকলন গ্রন্থ ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তখন পর্যন্ত গান্ধী বিষয়ক প্রকাশিত রকমারি রচনার একত্র সমাবেশ দেখতে পাই। তাছাড়া, "গান্ধী কীর্তন" নামে ঐ বৎসরই আর একখানা গ্রন্থও উক্ত লেখক বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "The Secret of Bapu" ('ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রথম প্রকাশিত) প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ সন্নিবিষ্ট আছে।

১৯২২ সনের ১০ই মার্চ গান্ধী সবরমতীতে গ্রেপ্তার হন। ১০ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত তাঁকে সবরমতী জেলে আটক রাখা হয়। ১২ই মার্চ উক্ত জেল থেকে গান্ধীজী কৃষ্ণদাসকে যে পত্র লেখেন তাতে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ "যদি একান্ত অসম্ভব না হয়, তাহলে (পত্রিকায় প্রকাশিতব্য) সকল রচনাই যেন তোমার হাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত যায়। সম্পাদক হিসাবে আমি কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করি—সতীশবাবু, রাজাগোপালাচারী, তুমি, সৈয়ীব কাকা, দেবদাস। সতীশবাবু যদি এখন তোমায় রচনায় নাম সহি করবার অনুমতি দান করেন, তাহলে আরও ভাল হয়।" ১৬ই তারিখে কৃষ্ণদাস গান্ধীজীর সঙ্গে উক্ত জেলখানায় দেখা করতে গেলে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির করেছেন সয়ীব কুরেশীকে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সম্পাদনের ভার দেবেন। এর পর সয়ীব কুরেশী

আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হ'লেও মূল দায়িত্ব এসে পড়েছিল কৃষ্ণদাসের উপর। কৃষ্ণদাসের অনুরোধেই সে সময় সতীশবাবুও কাশী থেকে সবরমতী এসেছিলেন গান্ধীজীর কাজে তাঁর ছাত্রকে সাহায্য করতে। সতীশবাবু মাত্র দু'মাস সবরমতী আশ্রমে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি পত্রিকা-সম্পাদনে যে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাতে আশ্রমবাসী সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস বলেন যে, ঐ দুই মাস সতীশবাবুই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রের সর্বপ্রধান লেখক ছিলেন। কিন্তু দুই মাস যেতে না যেতেই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও শারীরিক কারণে সবরমতী ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯২২ সনের মধ্যভাগে তিনি কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে সবরমতী থেকে কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

॥ ৩ ॥

১৯২২ সনের মধ্যভাগ থেকে ১৯২৭ সনের আরম্ভ পর্যন্ত সতীশচন্দ্র কলিকাতায় বসবাস করেন। স্থায়ী ঠিকানা ছিল ভাগ্নে মতিলাল গাঙ্গুলীর বাড়ী ১১০ নং হাজরা রোড, ভবানীপুর। এই সময় তিনি বহুদিন ৮৬বি মনোহরপুকুর রোডের বাগানবাড়ীতে বসবাস করেছেন। উক্ত বাড়ীর মালিক ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু, সহপাঠী ও গুরুভাই হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। এই সময় তিনি কিছুদিন ৭৯ নং বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে দত্তদের বাড়ীতে ছিলেন। তাছাড়া কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাসকয়েক জয়নগর-মজিলপুরস্থিত দত্ত-পরিবারেও কাটিয়েছেন। ঐ পরিবারের সকলেই সতীশবাবুর অনুরাগী ভক্ত। কলিকাতায় অবস্থানকালে কৃষ্ণদাসের লিখিত গান্ধী-বিষয়ক পত্রগুলি সতীশবাবুর হস্তে সংশোধিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী বইয়ের নাম ছিল *Seven Months with Mahatma Gandhi*। ঐ গ্রন্থের মূল বক্তব্য খুব সম্ভবত ১৯২৪ সনেই আবার বাংলায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় "গান্ধীজীর সহিত সাত মাস" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারেও বের হয়েছিল।

কলিকাতায় অবস্থানকালে সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে বাংলার জননায়কগণ প্রায়ই আসতেন। তৎকালে কলিকাতায় 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। শ্যামসুন্দরবাবুর সঙ্গে সতীশবাবুর ঘনিষ্ঠতা স্বদেশী যুগ থেকেই। স্বদেশী যুগে সতীশবাবু যখন 'ডন' পত্রিকা চালাতেন, সেসময় শ্যামসুন্দরবাবু তাঁর একজন উৎসাহী পাঠক ছিলেন। সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয় বলেন, একবার 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা অফিসে শ্যামসুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে

তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর টেবিলের উপর 'ডন' পত্রিকা সাজানো রয়েছে। তিনি শ্যামসুন্দরবাবুকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "আপনি 'ডন' পত্রিকা পড়েন?" উত্তরে শ্যামসুন্দরবাবু বলেছিলেন ঃ "এই 'ডন' পত্রিকা আমাকে 'বন্দেমাতরমে' প্রবন্ধ লিখবার মতো ১৫ দিনের খোরাক জোগায়।" এ থেকেই বুঝা যায় সতীশবাবুর প্রতি শ্যামসুন্দরবাবুর শ্রদ্ধা ছিল কত প্রগাঢ়। ১৯২২-২৬ সনে সতীশবাবু কলিকাতায় থাকাকালীন শ্যামসুন্দরবাবু মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ১১০ নং হাজরা রোডের বাসায় আসতেন। তাঁর অনুরোধে ঐ সময় সতীশবাবু অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার অধিকাংশই তৎকালে 'সার্ভেন্ট্' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী মতিলাল গাঙ্গুলী তাঁর অপ্রকাশিত "স্মৃতিকথায়" এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে, ঐ সময় সতীশবাবু অনেক সময় 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার জন্য 'লীডার' বা মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে দিতেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে সতীশবাবু মাঝে-মাঝে অন্যান্য পত্রিকায়ও লিখতেন। ১৯২৩ সনের মে মাসে আমেদাবাদের 'টুমরো' মাসিকে তাঁর "Song of Swaraj" বা "স্বরাজ-সংগীত" নামে যে সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়, তা তৎকালে বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তৎকালে ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এ.টি. গিডওয়ানী।

॥ ৪ ॥

এইভাবে বছর পাঁচেক কলিকাতায় অবস্থানের পর সতীশবাবু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২৭ সনের প্রারম্ভে গিরিডি অভিমুখে রওনা হন। এই হলো তাঁর জন্মভূমি ও যৌবনের কর্মভূমি বাংলার মাটি থেকে শেষবারের মতো বিদায় গ্রহণ। গিরিডিতে মাস খানেক অবস্থানের পর তিনি দ্বারভাঙ্গায় এসে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর স্বদেশী যুগের প্রিয় ছাত্র সতীশচন্দ্র গুহ তৎকালে দ্বারভাঙ্গা মহারাজের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। এখানে সতীশবাবু (মুখোপাধ্যায়) প্রায় তিন বছরকাল (১৯২৭-৩০) অবস্থান করে ১৯৩০ সনের ২৬শে এপ্রিল পাটনা অভিমুখে আবার রওনা হন, কারণ ঐ সময় সতীশ গুহ মহাশয়ও বিহার বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বিহার বিদ্যাপীঠের পরিচালক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন দুই বিহারী নেতা—বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ। রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বদেশী যুগে ডন সোসাইটিতে সতীশবাবুর নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। নিজের পুরানো গুরুকে বিদ্যাপীঠে পেয়ে সেদিন রাজেন্দ্র প্রসাদের আর আনন্দের সীমা ছিল না। সতীশচন্দ্রের এক অপ্রকাশিত পত্র (যা তিনি ১৯৩০ সনের ১৫ই মে বিহার

বিদ্যাপীঠ, পাটনা থেকে তাঁর ভাগিনেয়-পুত্র সুবোধ চন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখেছিলেন, তা) থেকে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে তাঁর কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ "তুমি বোধ হয় Rajendra Prasad Bihar Leader এর নাম শুনিয়াছ। সে আমার একজন old student. 1924 সনে Delhi তে আমি তাহার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম আমি তাহার village home Zeradai (Dt. Chapra) আর এই Bihar Bidyapith Ashram-এ একবার আসিব। গত জানুয়ারিতে আমি তাহার নিকট একমাসকাল তাহার অসুস্থতাবস্থায় Zeradai এর বসতবাটীতে গিয়াছিলাম। আর এখন তাহার আগ্রহাতিশয়ে কিছুকাল এই বিদ্যাপীঠে কাটাইতেছি। তাহার ইচ্ছা যে আমি এইখানেই permanent resident হইয়া থাকি। কোন কাজকর্ম করিতে হইবে না—কেবল এখানে বাস করিলেই তাহার কাজ হইবে ইহাই তাহার বিশ্বাস। সে যাহা হউক, এখানে বোধ হয় আরও কিছুদিন থাকিব কারণ স্থানটি খুবই স্বাস্থ্যকর আর আমার জন্য আহারাদি সম্বন্ধে পৃথক বন্দোবস্ত এখানকার কর্মকর্তা Brajakishore Prasadবাবু করিয়া দিয়াছেন। ..... তিনি একজন বড় নেতা—রাজেন্দ্র প্রসাদের senior, এবং সকল বিহারী নেতা ব্রজকিশোরবাবু ও রাজেন্দ্র প্রসাদ এই দুই নেতার তত্ত্বাবধানে কাজ করিয়া থাকেন। এই স্থানটি খুবই প্রশস্ত—প্রায় ১০০-১৫০ বিঘা জমি লইয়া এই আশ্রম গঠিত হইয়াছে। এখানকার বড় একটা অসুবিধা এই যে July-August-September এই তিন মাস বর্ষার জন্য এই স্থানে বড়ই জ্বরজারি হইয়া থাকে। তখন প্রায় সকলেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। অতএব বড় জোর June মাসের শেষকাল পর্যন্ত আমি এখানে থাকিতে পারিব। তখন আমাকে হয় Dharbhanga বা অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে।

"আমার Literary activities একপ্রকার বন্ধ। কৃষ্ণদাসের পুস্তকের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ভাবিয়াছিলাম আমার আর কিছুই কাজ থাকিবে না। তাহার পর রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এক Danish magazine এর জন্য Mahatma Gandhi and Religion নামে এক article লিখিতে হইয়াছিল। এখানকার কোন কাগজের জন্য ঐ প্রবন্ধ লেখা হয় নাই। উহা Danish ভাষায় তর্জমা করিয়া উহারা Gandhi Number of the Nye Verge (The New Road) মাসিকের October ও November সংখ্যায় ছাপায়। তাহারা আমার Original English article-টি Rajendra Prasad এর নিকট পাঠাইয়া দেয়। তখন আমার Zeradai অবস্থানকালে রাজেন্দ্র প্রসাদ

আমার অনুমতি লইয়া Hindusthan Review for February সংখ্যায় ছাপাইয়া দেয়। উহা হইতে এখানকার Searchlight পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। তাহার পর Sunday Bombay Chronicle-এ উহা ছাপা হইয়াছিল দেখিতেছি। আমি জানিতাম না। কিন্তু উহারা article-এর নাম বদলাইয়া দিয়াছে—দিয়াছে 'Mahatmaji's Battle for Freedom'।

"ইহার পর আমার আর অন্য কোন লেখা হয় নাই। তবে Rajendra Prasad একটা লম্বা লেখা লিখিয়াছিল—নাম Non-Violence vs. Violence। উহা booklet formএ ছাপা হইবার কথা—তাহা আমাকে দেখিতে দিয়াছে। উহা revise করিতে বিলম্ব হইতেছে—কারণ গত দুই মাস কাল public events study করিতে গিয়া আর সময় পাইতেছি না। উহা কবে শেষ করিতে পারিব বুঝিতে পারিতেছি না। এদিকে রাজেন্দ্র প্রসাদের গ্রেপ্তার শীঘ্র হইয়া যাইতে পারে। সময় খুবই সঙ্গীন, কখন কাহার কি হয় বলা যায় না।"

॥ ৫ ॥

এইভাবে বিহার বিদ্যাপীঠে মাস তিনেক (এপ্রিল, মে, জুন, ১৯৩০) অবস্থানের পর সতীশবাবু সতীশ গুহকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় কাশীধামে ফিরে আসেন। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ আঠারো বছর (১৯৩০-১৯৪৮) সতীশবাবু পুরাপুরি কাশীবাসী হয়েই ছিলেন। তিনি এবার কাশীতে প্রথমে বাস করতেন ত্রিপুরা-ভৈরবে ডাঃ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে; তারপর ৪৭ তেড়েনীমে। এখানে তিনি দোতলা বাটী ভাড়া করে ঠাকুর-চাকর রেখে ছাত্রদের নিয়ে জীবন কাটাতেন। এখানে 'বড়বাবু'র যে দু'জন ছাত্র তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন তাঁদের একজন হলেন কৃষ্ণদাস, আর একজন হলেন সতীশ গুহ। প্রথমবারের মতো এবারও সতীশবাবুর কাছে কাশীর প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ও জননায়কগণ মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এই সময় যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিন্ধী পণ্ডিত কে. পি. এস. মালানি (যিনি পরে বেনারস সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন), এবং প্রভাত চন্দ্র দাঁ ও রমাপ্রসাদ দাঁ মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। মালানি সাহেব সতীশবাবুর নিকট সান্নিধ্যে আসেন ১৯৩৫ সন থেকে ও প্রভাতচন্দ্র দাঁ ১৯৪১ সন থেকে। সতীশবাবুর শেষ জীবনের সঙ্গে তাঁরা উভয়েই গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দাঁ এক পত্রে (২১/১১/৫২ সনে কাশী থেকে লেখা পত্রে) আমাদের জানিয়েছেন ঃ "আমি ১৯৪১ সনের আগষ্ট মাসে 'বড়বাবু'র সংস্পর্শে আসি। তিনি প্রথম

হইতেই আমাকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া লন এবং শেষ পর্যন্ত আমি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকি। আমি যখন প্রথমে তাঁহাকে দেখি তখন তিনি সংসার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছিলেন। তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন (এবং সেখানে ˚বিনয় সরকার মহাশয় তাঁহার কন্যাসহ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন) সে বাড়ীতে রাত্রে চাকরকেও থাকিতে দিতেন না। কেবল গুটিকয়েক অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিতেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ spiritual problem solve করিয়া লইতেন। তাঁহাদের মধ্যে মালানি সাহেব অন্যতম।"

এই সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তেরা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক সমস্যা সতীশবাবুর নিকট লিখিতভাবে উপস্থিত করতেন এবং সতীশবাবুও ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবেই দিতেন। হারাণ চন্দ্র চাকলাদার মহাশয় ২০.৬.১৯৪৮ সনে পুরী থেকে লেখা এক পত্রে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, মালানি সাহেব "সতীশবাবুর সহিত বহুকাল ধরিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা করিয়াছেন। সেই সমুদয় আলোচনা ৬০/৭০ খানা মোটা Exercise Book-এ প্রফেসর Malani লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সতীশবাবু তাহার প্রায় সমুদয়ই দেখিয়াছেনে।" কৃষ্ণদাস ও সতীশ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে আমরা অনুরূপ সংবাদই পেয়েছি। এই সকল প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সতীশবাবুর শেষ জীবনের দার্শনিক চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সতীশবাবুর জীবনেতিহাসে সে ও ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সকল লিখিত উপাদান নিঃসন্দেহে বিশেষ মূল্যবান। অথচ পরিতাপের কথা এই যে, এই সকল উপাদান নাকি প্রকাশিতব্য নয়। মালানি সাহেব আমাদের জানিয়েছেন, "Bara Babu told me specially that these were not meant for publication," শিতিকণ্ঠ ঝা মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অনুরূপ। তিনি যোগীনবাবুকে (যিনি ছিলেন গোঁসাইজীর শিষ্য ও সতীশবাবুর গুরুভাই, তাঁকে) একবার সতীশচন্দ্রের লিখিত একটি পত্র নিরুপায় অবস্থায় প্রদর্শন করেছিলেন। এই ঘটনা সতীশবাবুকে তিনি (শিতিকণ্ঠ ঝা) পত্রযোগে জানালে বড়বাবু শিতিকণ্ঠকে ধমকের সুরে লিখেছিলেন, "My letters to you are meant for you alone. Who gave you the permission to show the letters to others? Be careful. This must not happen again." *(Selected Works of Acharya Satish Chandra Mukherjee*, Sept., 1988, pp. 71-72 দ্রষ্টব্য) ষাটের দশকে বহুবার কাশী দর্শনে গিয়ে কখনও সতীশ গুহ (ছোটবাবু), কখনও প্রভাতচন্দ্র দাঁকে সঙ্গে নিয়ে মালানি সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে আকুল আবেদন জানিয়েছিলাম

সতীশচন্দ্রের যে রত্নভান্ডার তাঁর হেফাজতে সংগোপনে গচ্ছিত রয়েছে তার বন্ধনদশা ঘুচিয়ে বহির্বিশ্বে উন্মোচন করবার জন্য। কিন্তু আমাদের আবেদনে তিনি কোন সাড়া দেননি। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনমনীয় মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা হীরা মালানিও তাঁর পিতার দৃষ্টিভঙ্গি (সতীশচন্দ্রের চিঠিপত্রাদি প্রকাশের ব্যাপারে) অনুসরণ করে চলেন ১৯৭০-এর দশকের শেষাশেষি পর্যন্ত। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পুনঃপুনঃ অনুরোধের ফলে হীরা মালানি যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তিনি সতীশচন্দ্র সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রাদি (বহু খন্ডে বাঁধাই করা খাতাগুলি) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হাতে সমর্পণ করতে সম্মত হন। এই হস্তান্তর প্রসঙ্গে শিক্ষা পরিষদের সচিব খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৮০ সনের ১৭ই জুন ঐ মহামূল্য দলিলগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর ডঃ রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্তের হস্তে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষে শিতিকণ্ঠ ঝা সমর্পণ করেন যথোপযুক্ত সংরক্ষণের তাগিদে।

কাশীতে অবস্থান কালে এবারও সতীশবাবু পূর্বের মতো "আকাশ বৃত্তি" অবলম্বন করে জীবন কাটাতেন। তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৮৯৭ সনে তাঁকে এই "আকাশ বৃত্তি" ব্রত দিয়ে যান এবং তদবধি তিনি এই ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে আমৃত্যু পালন করে গেছেন। কিভাবে তাঁর অর্থ সংগৃহীত হতো, তা কেউই সঠিকভাবে জানে না। খুব সম্ভবত তাঁর গুণগ্রাহী ও ভক্তদের কাছ থেকে তিনি মাঝে মাঝে যা পেতেন তা দিয়েই তাঁর খরচ-পত্র চলতো। বাহ্যত গৃহীর বেশভূষায় থাকলেও তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন সন্ন্যাসী। বিষয়-বাসনার প্রলোভন ও নামযশের মোহ থেকে তিনি নিজের আত্মাকে চিরঅম্লান ও চিরপবিত্র রেখেছিলেন। অতি-বড় ত্যাগী পুরুষকেও অনেক সময় দেখা যায় নামযশের প্রলোভনে প্রলুব্ধ। সতীশবাবু সে প্রলোভনও ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখুক বা আলোচনা করুক তা কোনদিনই তাঁর কাম্য ছিল না। শুধু তাই নয় এ বিষয়ে তিনি তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদের স্পষ্টভাষায় বারণও করে দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সনের শেষাশেষি "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লে ঐ বইয়ের দু'কপি বিনয়বাবু কাশীতে সতীশবাবুর (বড়বাবু-র) উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। সতীশচন্দ্রের সেবক ও নিত্যসঙ্গী সতীশ গুহ মহাশয় (ছোটবাবু) ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ সনে উক্ত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার উপলক্ষে বিনয়বাবুকে যে পত্র লেখেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। গান্ধীগ্রাম, বেনারস থেকে সতীশ গুহ লিখেছিলেন ঃ

"দাদা,

"আপনার কার্ড পাইলাম। বই-দু'খানা যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল এবং একখানা তখনি শ্রীযুক্ত সতীশবাবুকে দিয়াছি। তিনি খানিকটা মাত্র পড়িয়াছিলেন। এখন অনেক-অনেক বন্ধু-বান্ধবদের হাতে ঐ উৎকৃষ্ট এবং শিক্ষাপ্রদ পুস্তকের উভয় কপিই ঘোরাঘোরি করিতেছে। যাঁহারা পূর্বে আপনার লেখার ধরণ পছন্দ করিতেন না, এই বই তাঁহারাও আগ্রহ করিয়া পড়িতেছেন এবং উপকৃত হইতেছেন, এরূপ স্বীকারোক্তি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু আর বেশি দূর পড়িতে পারিতেছেন না এই জন্য যে পুস্তকের মধ্যে পুনঃপুনঃ তাঁহার নিজের নাম এবং গুণগান আছে বলিয়া তাঁহার নিজের পড়িবার আগ্রহ নাই। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ বিনয় বেশি কথা বলিত না বা প্রশ্নাদি করিত না বটে, কিন্তু ভাবধারার মূলসূত্রটি সে সব সময় ধরিতে পারিত, দেখিতেছি।" নিজের প্রশংসাত্মক গুণগানের প্রতিও এমন নিস্পৃহ মনোভাবের দৃষ্টান্ত বস্তুতঃই ইতিহাসে অতি-বিরল।

একজন জার্মানি পণ্ডিত E. G. Schulze – যিনি সাধু সদানন্দ নামে পরে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি — ১৯৪৮ সনের জুন মাসে "কল্যাণ কল্পতরু" নামক ইংরেজী মাসিকে (গোরক্ষপুর, ইউ, পি, থেকে প্রকাশিত পত্রে) "বড়বাবু" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৩৭ সনে "বড়বাবুর" সঙ্গে সাধু সদানন্দের (একজন বৈষ্ণব সাধুর) প্রথম পরিচয়। তিনি বড়বাবুর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাজকর্মের বিষয় জানতে উৎসুক ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, যে বস্তু তাঁকে সতীশবাবুর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল তা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন। তাঁর মতে সাধু সন্ন্যাসীর বাহ্য চটক বা ভড়ং বড়বাবুর আদৌ ছিল না; না ছিল তাঁর আশ্রম, না ছিল তাঁর কোন মন্ত্রশিষ্য, না ছিল তাঁর গুরুগিরির ধর্মাসন। সাধু সদানন্দ আরও লিখেছেন যে, বড়বাবু ছিলেন অন্তরে বাহিরে মুক্ত, শুদ্ধ, সহজ ও সরল। প্রত্যেক ধর্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি সর্বদাই অকৃপণভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। "Man-to-man talk, direct approach, no show, no eye-wash, no pretension" এই ছিল সাধু সদানন্দের দৃষ্টিতে "বড়বাবুর" চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি স্বরূপ হ'লেও তাঁর জীবনদর্শনে দুর্বলতার কোন স্থান ছিল না — "There was no trace of inefficiency under the guise of mysticism in him" অর্থাৎ সাত্বিকতার আবরণে তাঁর জীবনদর্শনে কোন ক্লৈব্য, কোন তামসিকতার ঠাঁই ছিল না। সাধু সদানন্দ পরিশেষে লিখেছেন যে, বড়বাবুর মতো যথার্থ সন্ন্যাসী বা মহাত্মা তিনি জীবনে আর কখনও দেখেননি।

আচার্য সতীশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসঙ্গী অধ্যাপক মালানি সতীশচন্দ্র বা 'বড়বাবুর' দেহ সৌষ্ঠব প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "শারীরিক গঠনে তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণ, সুদর্শন চেহারার মানুষ। তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত, ভ্রূযুগল ছিল ঘন লোমাবৃত। তিনি ছিলেন শুভ্রকেশ গোঁফ-দাড়ি সম্বলিত। কখনও নাপিতের সাহায্য নিতেন না। তাঁর চোখের মধ্যে এমন একটা দ্যুতি ছিল যা জলে বা স্থলে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হতো না ..... তিনি হাঁটবার সময় অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে পদ সঞ্চালন করতেন। আমি বয়সে তাঁর থেকে ত্রিশ বছরের ছোট হয়েও ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারতাম না।"

আশি বছর বয়সেও "বড়বাবুর" অর্থাৎ সতীশচন্দ্রের কর্মশক্তির, বিশেষত মস্তিষ্ক-চালানোর শক্তি কী অসাধারণ ছিল মালানি সাহেব তা প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। ঐ বৃদ্ধ বয়সেও শিরদাঁড়া (spinal column) সম্পূর্ণ সোজা বা টান রেখে তিনি দুরূহ আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর একটানা ছয় ঘন্টা ধরে কলম চালাতে পারতেন। মনের সমস্ত শক্তি একাগ্র করে তিনি যে কী কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন, চোখে না দেখলে তা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মালানির একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

মালানি সাহেব লিখেছেন যে, কোনও একটি আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে তিনি সতীশচন্দ্রের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। সতীশবাবু সেটা বুঝতে পেরে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির আরও বিশদ্ ব্যাখ্যা করে মালানি সাহেবকে একই দিনে যে চারখানা সুদীর্ঘ পত্র (পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র) লিখেছিলেন মালানি সাহেব তার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যেখানে থাকতেন, বড়বাবুর আবাসস্থল সেখান থেকে শহরে ছিল তিন মাইল দূরে। একদিন খুব ভোরবেলা বড়বাবুর সেবক এসে মালানি সাহেবের হাতে একখানি বারো পৃষ্ঠার চিঠি সমর্পণ করে। উত্তর চাই সঙ্গে সঙ্গে। দুপুর ১টা নাগাদ মালানি সাহেব যখন কলেজের উদ্দেশে রওনা হতে চলেছেন তখন তিনি পেলেন পূর্ববৎ দীর্ঘ আর একটি পত্র। বিকাল ৪টার সময় কলেজ থেকে বাড়ী ফিরলে তাঁর হাতে পৌছল তৃতীয় আর একখানি দীর্ঘ পত্র, এবং রাত ৮টায় পৌছল বড়বাবুর দীর্ঘ চতুর্থ পত্রটি। এভাবে বড়বাবু একদিনে প্রায় ৫০ পৃষ্ঠার "close and cogent reasoning" সম্বলিত চারখানা পত্র লিখে পাঠান। মালানি সাহেবকে একই দিনে চারখানা চিঠির উত্তর লিখতে হয় এবং বড়বাবুর পত্রবাহককে দৈনন্দিন অন্যান্য কাজ ছাড়াই

অতিরিক্ত ২৪ মাইল সাইকেলযোগে পথ-পরিক্রমা করতে হয়েছিল উক্ত চিঠিগুলির আদান-প্রদান উপলক্ষে। মালানি সাহেব লিখেছেন ঃ "In pursuit of the spiritual objective, Barababu spared neither himself nor others." *(Selected Works of Acharya Satish Chandra Mukherjee,* Calcutta 1988, গ্রন্থে মালানি সাহেবের নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৮।)

।। ৬।।

শেষ জীবনে সতীশবাবু ব্যক্তিগত জীবনে যে ধর্ম পালন করতেন, তা কোন বিশেষ মহাপুরুষের পূজা বা নির্জন ধ্যানধারণা নয়। তাঁর পূজার ঘরে তাঁর গুরুদেব প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরও কোন ফটো ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী সতীশ গুহ মহাশয় বলেন যে, এই সময়ে সতীশবাবুর জীবনে শিশুদের সেবাযত্নই প্রধান হয়ে ওঠে। মৃত শিশুদের ছবি তাঁর ঠাকুরঘরের বেদীতে সমাসীন থাকতো। সতীশ গুহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রকে বড়বাবু বড়ই ভালবাসতেন। তাদের দু'জনেই অকালে সংসার থেকে বিদায় নিলে তাদের ছবিও বড়বাবু ঠাকুর ঘরে রেখেছিলেন। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় এই সকল মৃত শিশুদের ফটোগুলির সামনে ধুপধূনা জ্বালাতেন ও তাদের উদ্দেশ্যে ভোগ দিতেন। তাদের শোবার জন্য স্বতন্ত্র বিছানা, তোষক, বালিশ, ও মশারীরও ব্যবস্থা ছিল। রোজই রাত্রিতে তাদের বিছানায় শুইয়ে দিতেন ও মশারী টাঙ্গিয়ে দিতেন। দরজা বন্ধ করে ঠাকুর ঘরে তাঁকে নির্জন ধ্যানধারণা করতেও বড় একটা দেখা যেতো না। শিশুদের সেবাই ছিল তখন তাঁর এক প্রধান কাজ। তাদের জন্য খেলনা জোগাড় করা, তাদের নানা আব্দার পালন করাই ছিল এই স্তরে সতীশবাবুর পরম ধর্ম। ১৯৪৭ সনের ১৯শে ডিসেম্বর এক পত্রে তিনি কৃষ্ণদাসকে লিখেছেন ঃ "তুমি যে foreign postage সতীশের (অর্থাৎ সতীশ গুহের) পুত্র শ্রীশ্রীবাবা ছোটখোকামণির জন্য পাঠাইয়াছ, তাহা হস্তগত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তোমার নিকট বিশেষভাবে personally grateful জানিবে। বাবাকে আনন্দ দেওয়া আমার এক প্রধান কাজ হইয়া পড়িয়াছে। উহা আমার একটি বিশেষ সেবাকার্য। সেই জন্য আমি ঐ postage stamp গুলি পাওয়ায় তোমার নিকট personally grateful মনে করিতেছি। ইহার ফলে শ্রীশ্রীগুরুদেবও আমার প্রতি প্রীত হইবেন।" অর্থাৎ গুরুসেবা ও শিশুসেবা সতীশবাবুর দৃষ্টিতে তখন এক ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

।। ৭।।

শেষ বয়সে ধর্মই সতীশচন্দ্রের জীবনে মূলীভূত বিষয় ছিল; অন্যান্য সকল

কাজ আনুষঙ্গিকমাত্র—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ধর্মসাধনায় জীবন কাটালেও বৃদ্ধ বয়সেও সতীশবাবু দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের গতিতে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। ১৯৩৯ সনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে 'রাষ্ট্রপতি' সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন-চিন্তা-বিরোধ দেখা দেয় ও সমগ্র ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সে সময়েও সতীশবাবু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন। তাঁর অপ্রকাশিত পত্রগুলিই এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঐ সময় বাঙালীদের মধ্যে অনেকে মহাত্মা গান্ধীর উপর প্রাদেশিকতার দোষ আরোপ করতে থাকেন। জয়নগর-মজিলপুরের ফণীন্দ্রনারায়ণ দত্ত মহাশয় ১৯৩৯ সনের মার্চ মাসের প্রথম দিকে এ বিষয়ে পত্র-মারফৎ সতীশবাবুর মতামত জানতে চাইলে, সতীশবাবু তার উত্তরে জানিয়েছিলেন ঃ

[২৮.৩.১৯৩৯]

"No provincialism.

We are attributing provincialism to him because we are Bengalis and Subhas is a Bengali.

Mahatmaji has decided the matter from a different angle, which we as Bengalis find it difficult to appreciate.

And all this because we are steeped in Bengali provincialism." অর্থাৎ "গান্ধীজীর উপর প্রাদেশিকতার দোষ আরোপ করা ভুল। তাঁর উপর আমরা প্রাদেশিকতা আরোপ করছি কারণ আমরা বাঙালী আর সুভাষও বাঙালী। মহাত্মাজী সমস্যাটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন—যা আমরা বাঙালী বলে আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন হয়েছে। আর এই সমস্ত কিছুর কারণ হলো আমরা বাঙালী প্রাদেশিকতায় নিমজ্জিত।" বৃদ্ধ বয়সে সতীশবাবুর রাষ্ট্রিক চিন্তাধারা বুঝবার জন্য এই ধরণের পত্রগুলিই সবচেয়ে বেশী সহায়ক। পরলোকগত দর্শনশাস্ত্রের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এক লিপিতে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, সতীশবাবুর মতো এমন উৎসাহী শিক্ষক ও ত্যাগী পুরুষ তিনি জীবনে দেখেননি। সতীশবাবু বৃদ্ধ বয়সেও কাশী থেকে চিঠি-পত্র লিখে তাঁর পুরানো ছাত্রদের খোঁজখবর নিতেন। চিঠি লেখায় সতীশবাবুর আলস্য কোনদিনই ছিল না। ১৯৪৬-৪৭ সনে গান্ধীজীর নোয়াখালিতে অবস্থানকালে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর অনেকগুলি পত্রালাপ হয়েছিল। সেই সকল চিঠিপত্র বহুদিন পর্যন্ত কৃষ্ণদাসের কাছে ছিল, কিন্তু সতীশবাবুর দেহাবসানের (১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮-এর) পর নানা

গোলযোগে সেগুলি বেহাত হয়ে যায়। আমরা পরবর্তীকালে অন্যান্য উৎস থেকে এই পত্রালাপের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করতে পেরেছি, বিশেষত কাশীর প্রভাত চন্দ্র দাঁ মহাশয়ের সৌজন্যে। ডঃ মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'ডন'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণে (Reprint Edition-এ) গান্ধী-সতীশচন্দ্র পত্রালাপের কিছু নমুনা আমরা তুলে ধরেছি আমাদের লেখা Foreword বা ভূমিকায়। গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও সতীশচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক কর্ম-কৌশলের কোনো কোনো দিক সমর্থন করতে পারেননি।

১৯৪৭ সনে বঙ্গভঙ্গ ও ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সারা দেশকে চঞ্চল করে তোলে—হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি এক জটিল রূপ ধারণ করে। বিরাশি বছর বয়সেও ঐ সকল সমস্যা নিয়ে সতীশবাবু কত সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা করেছিলেন, তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় শিতিকণ্ঠ ঝাঁ মহাশয়ের (বিহার খাদি সমিতির শিক্ষক ও কর্মীর) নিকট লিখিত তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ-পত্রে। ঐ পত্রখানি আমরা ইতিপূর্বেই 'বিশ্ববাণী' মাসিক পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৫৯ সংখ্যায়) প্রকাশ করেছিলাম। ঐ পত্রে সতীশবাবুর এ বিষয়ে রাষ্ট্রিক মতামত জ্বল-জ্বল করছে। বিগত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রিক ক্রমবিকাশ, মুসলিম লীগের জন্ম, কংগ্রেস-লীগের আদর্শ-বিরোধ, দ্বিজাতি তত্ত্বের উৎপত্তি, ইংরেজ সরকারের নীতি ও পাকিস্তানের জন্মকথা ওখানে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। পত্রের শেষাংশে সতীশবাবু জিন্না সাহেবের পাকিস্তান দাবির প্রতি কংগ্রেসী মনোভাব ও হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে গান্ধীজীর অহিংসনীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রশ্ন হইতেছে, যদি মুসলিম নেতৃবর্গের হৃদয়ের ভাব ইহাই হয় যে, হিন্দুস্থানস্থিত হিন্দুদের উপর মুসলিম আধিপত্য স্থাপন ও বিস্তার করিতেই হইবে, তবে হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করতঃ তাহাদের রাজনৈতিক আকাঙ্খা পূরণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এমত অবস্থায় যদি মুসলমানদিগকে বলা যায়— 'হিংসা ত্যাগ কর এবং অহিংস সূত্রে হিন্দুদের সহিত মেলামেশা কর'—এই উপদেশ তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না। অর্থাৎ কেবলমাত্র অহিংস-বাদের উৎকর্ষ ও হিংসাবাদের অপকৃষ্টতা প্রচার বা ব্যাখ্যা দ্বারা কোন ফলোদয়ই হইবে না। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে তাহাদের হিংসাত্মক নীতি প্রয়োগ করিতে থাকিলে যদি হিন্দুগণ উহা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারে তবেই অহিংসা প্রণালী যথাযথ পরীক্ষিত হইতে পারিবে। এইরূপেই মুসলমানদিগের

হিংসাপন্থার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া মহাত্মাজীর অহিংসাপন্থার কার্যকারিতা সহজেই বুঝা যাইবে। এই প্রকার অহিংসা পন্থা অবলম্বিত হউক ইহাই মহাত্মাজীর ব্যবস্থা। ইহার ফলে হিন্দুদিগের ক্লেশের ও যাতনার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুসলমানদিগের হিংসাপূর্ণ হৃদয় গলিয়া যাইবে—ইহাই মহাত্মাজীর বিশ্বাস। কারণ মহাত্মাজীর শিক্ষার সার ইহাই যে শত্রুপক্ষের change of heart করা প্রয়োজন। ..... আমি ভগবৎ বিশ্বাসী। আমার মনে হয় মহাত্মাজীর ব্যবস্থা যদি কার্যে পরিণত করিতে হয় তবে অহিংসযুদ্ধের logicality-র দিক হইতে বিচার করিলে চলিবে না। সমগ্র অহিংস-সংগ্রাম দ্বারা logicaly বলা যাইতে পারে যে মহাত্মাজীর ব্যবস্থা কার্যকরী। অর্থাৎ তিনি যে প্রকার transformation of the heart of the opposing side fighting it out on the হিংসাত্মক basis, — ব্যাখ্যা করিয়াছেন, logically তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না। কিন্তু human mind যেরূপভাবে গঠিত বা constituted তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলা যায় যে ঐরূপ পরিবর্তন on a mass scale সুদূরপরাহত।" সতীশবাবু উক্ত পত্রে ১৯৪৭ সনের ভারতীয় রাষ্ট্রিক অবস্থার যে তীক্ষ্ণ পর্যালোচনা করেছেন, তা কোন রাজনৈতিক দলের সপক্ষে বা বিপক্ষে শক্তি ও সমর্থন জোগানোর জন্য নয়, আর তা প্রকাশিত হোক তার জন্য তো নয়ই। একান্তভাবেই ঐ পত্র বিশিষ্ট একজন ব্যক্তির কাছে লিখিত ব্যক্তিগত পত্র মাত্র; আর যিনি পত্রলেখক তিনিও কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত সাধারণ মানুষ নন। একজন নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে ১৯৪৭ সনের ভারত-বিভাগ ও হিন্দু-মুসলিম সমস্যা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সতীশচন্দ্রের ঐ চিঠিখানিতে। কাজেই সতীশবাবুর এই পত্রখানির ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রগুলি ছাড়া সতীশবাবুর শেষ জীবন সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানার প্রামাণিক উৎস আর বেশি কিছু নেই। দুর্ভাগ্যবশত ঐ সকল পত্রের অধিকাংশই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় পর্যন্ত (এপ্রিল, ১৯৬০) ছড়ানো ছিল কাশীতে কয়েকজনের হাতে। তাঁদের কাছ থেকে বহু চেষ্টা করেও পত্রগুলি সেসময় আমাদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা বলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে সতীশবাবুর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল এই মর্মে যে, পত্রগুলি প্রকাশিত হবে এই কারণে ঐগুলি লিখিত হয়নি আর কেউ যেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু না লেখেন। সতীশবাবু সারাজীবন নামযশ ও আত্মবিজ্ঞাপনের প্রলোভন বিষবৎ বর্জন করেছেন। আত্মপ্রচারের প্রতি তাঁর এমন নিস্পৃহ ও অনাসক্ত মনোভাব

মানুষমাত্রেরই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর মহান ও পবিত্র স্মৃতিকে দেশবাসীর মনে জাগরূক রাখার দায়িত্ব সকলের আগে তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তদের। সতীশবাবুর মতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন ও বাণী যতই আলোচিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই মহাকর্মীর জীবনকথা জাতীয় ইতিহাস রচনার এক অমূল্য উপাদান। কাজেই অন্ধভক্তির মোহ থেকে মন ও বুদ্ধিকে মুক্ত করে সতীশবাবুর জীবনকথা বস্তুনিষ্ঠভাবে ও বিশদভাবে আলোচনার দিকে তাঁর শেষজীবনের সঙ্গী, সেবক ও শিষ্যদের সত্বর অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় দেশবাসী জানাবে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই এই কথাগুলি আমরা লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাদের আবেদন ব্যর্থ হয় নি।

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে সতীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন ও কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর ১৮ই এপ্রিল তিনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন। তাঁর লোকান্তর-সংবাদ ২০শে এপ্রিল কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়। তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি উপলক্ষে ডন সোসাইটির ছাত্র বিনয় সরকার লিখেছিলেন ঃ "He was one of the makers of the Bengali Revolution (1905-14) and a father of the Indian Freedom Movement. In him the Indian people has lost an epoch-making pioneer as much of constructive social work as of researches and investigations into economics, politics, sociology and culture-history" অর্থাৎ "তিনি ছিলেন বঙ্গবিপ্লবের (১৯০৫-১৪) অন্যতম জন্মদাতা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন জনক। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবাসী তাদের একজন গঠনমূলক সমাজসেবক এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজশাস্ত্র ও সংস্কৃতি-ইতিহাস গবেষণার একজন যুগস্রষ্টা প্রবর্তককে হারিয়েছে।"

পরিশিষ্ট (ক)

উনবিংশ শতকে বাংলার সমন্বয় সাধনা

॥ ১ ॥

পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলা (ও ভারতে) ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ও সেই সঙ্গে ইংরেজের মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূচনা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই যোগসূত্রের পরিণতি উজ্জ্বলভাবে দেখা দেয় উনবিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের মধ্যে। ১৭৮৪ সনে ইংরেজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় (১৫ই জানুয়ারি, ১৭৮৪) এর প্রথম গোড়াপত্তন দেখতে পাই। উইলিয়াম জোন্স, চার্লস্ উইলকিন্স্ ইত্যাদি থেকে শ্রীরামপুর মিশনারীদের ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের যে সমবেত ও সজাগ প্রচেষ্টা (১৭৮৪-১৮১৪) তা বাংলার উনবিংশ শতকের রেনেসাঁসের ইতিহাস থেকে কোনক্রমেই বাদ দেওয়া যায় না। প্রাক্-রামমোহন যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির সেবক ও সাধক হিসাবে এঁদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।[১]

॥ ২ ॥

উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে যে বিরাট মনীষীর সাধনাকে আশ্রয় করে বাংলার নবজাগরণের নতুন সূচনা দেখা দেয়, তিনি রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন যুগস্রষ্টা। পুরাতন হিন্দু ঐতিহ্যের শেষ প্রতিনিধি ও নবযুগের প্রথম ভারতীয় বীর হিসাবে তিনি যুবক দুনিয়ার প্রণম্য। হিন্দু, ঐস্লামিক ও খৃষ্টান এই তিন সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি দুর্জয় সাহসের সঙ্গে সমন্বয়ের সাধনা করেছিলেন এবং সেই সমন্বয়ের বার্তা তিনি নিদ্রিত জাতির কানে তুর্যনিনাদে ঘোষণা করেন। তিনি একদিকে চেয়েছিলেন শক্তিমদোন্মত্ত খৃষ্টান সভ্যতার আক্রমণ থেকে হিন্দু জাতিকে রক্ষা করতে, আর একদিকে অন্তর থেকে কামনা করেছিলেন আধুনিক ইউরোপের অর্থাৎ বেকনোত্তর যুগের পজিটিভ্ সায়েন্স বা জড় বিজ্ঞানের ধারা দেশের বুকে প্রবাহিত করতে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে—বিজ্ঞানের কোঠায়—তাকে তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার ও গ্রহণের মধ্যেই

(১) এই বিষয়ের উপর বিস্তৃত আলোচনা হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের "ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার" (কলিকাতা, ১৯৫৮) পুস্তকে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে কলিকাতার "এশিয়াটিক সোসাইটি" থেকে প্রকাশিত *Asiatic Researches* (1884) গ্রন্থখানি এবং বিনয় সরকারের *Creative India* (Lahore, 1937, pp. 448-49) পুস্তকখানি পঠিতব্য।

জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত বলে সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতে বেকনীয় ও বেকন-পরবর্তী চিন্তাধারাগুলি আমদানী করার বিষয়ে এতটা উৎসাহী ও অগ্রণী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ, এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের তিনি ছিলেন এক বিরাট অগ্রদূত।

।। ৩ ।।

ধর্মক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন নবযুগের প্রবর্তক। তিনি ছিলেন অনেকটা দু-মুখো ছুরির মতো। তাঁর এক মুখ ছিল পূবের দিকে—সনাতনী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিদের দিকে—আর এক মুখ ছিল পশ্চিমের দিকে—সভ্যতাভিমানী খৃষ্টান মিশনারী বা পাদ্রীদের দিকে। খৃষ্টান পাদ্রীদের নিকট তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে কুসংস্কার আছে বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মেও কুসংস্কার এর চেয়ে বড় কম নয়, বরং তুলনায় বেশি। আবার সেই সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিদের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জানালেন যে, বাঁচার মতো বাঁচতে হ'লে ছাড়তে হবে আমাদের পৌত্তলিকতা, ছাড়তে হবে তামসিকতা, ছাড়তে হবে অতীতের অন্ধ সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথার আবর্জনা। একদিকে মিশনারীদের বিরুদ্ধ আক্রমণ থেকে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করা আর অন্যদিকে অন্ধকার ও কুসংস্কারের বন্ধন থেকে জাতিকে উদ্ধার করা—এই দ্বিবিধ লক্ষ্য তাঁর জীবনে মিলিত হয়েছিল। তিনি পশ্চিমমুখো হয়ে বিবেকানন্দের ন্যায় লড়াই করেছেন মিশনারীদের বিরুদ্ধে; তিনি পুবমুখো হয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন জাতিভেদ প্রথা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। হিন্দুধর্মের অনুদারতা তাঁর চিত্তকে যেমন পীড়িত করে, তেমনি নব্যশিক্ষিত যুবকদের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মোহনও তাঁর স্বদেশপ্রাণ আত্মাকে ব্যথা দেয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সম্মোহনে হিন্দুধর্ম বর্জন করে খৃষ্টান ধর্মের পেছনে ধাবমান যাত্রীদের দৃশ্য তাঁর মনে যে দুঃখজনক আলোড়ন সৃষ্টি করে, তারই গঠনমূলক প্রকাশ হলো ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটা সংস্কৃত ও আধুনিক গড়ন মাত্র। ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে ধর্মক্ষেত্রে এদেশে নব নব সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে। রামমোহন সেই সকল বীর-মানব বা মহামানবের অন্যতম। উপনিষদ-বেদান্তে প্রচারিত ধর্মের আধুনিক সংস্করণের নামই ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্মের আসল বস্তু নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা। এর আদি উৎস উপনিষদ-বেদান্তে। ১৮৩০ সনে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এই চিন্তাধারার বাস্তব মূর্তি। ব্রাহ্মধর্মের অর্থাৎ হিন্দুধর্মের নতুন ও যুগোপযোগী সংস্করণ প্রবর্তন করে রামমোহন হিন্দুধর্মকে

একদিকে রক্ষা করলেন খৃষ্টান মিশনারীদের অন্যায় আক্রমণ থেকে আর অন্যদিকে হিন্দুধর্মকে বাঁচালেন রক্ষণশীল ও অধঃপতিত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব থেকে। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে রামমোহনই হিন্দুজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম নব হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সহজ সত্যটি পরিষ্কার ভাবে স্মরণে রাখলে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলার নবজাগরণের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির যথার্থ স্বরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে সহজ হবে।[২]

॥ ৪ ॥

রামমোহনের সময় ব্রাহ্মধর্ম ছিল স্বপ্ন। তাঁর দেহাবসানের পর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগিশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের নাম প্রথমেই স্মরণীয়। "তত্ত্ববোধিনী সভা" স্থাপন করে (১৮৩৯), অক্ষয় দত্তের সম্পাদনায় ঐ সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বের করে (১৮৪৩), ব্রাহ্মসমাজকে এক সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত করে, দীক্ষা প্রথা ও ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্তন করে দেবেন্দ্রনাথ উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে বাংলাদেশে এক রীতিমত ব্রাহ্ম-আন্দোলন গড়ে তোলেন। "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পূর্বে উক্ত সমাজের অবস্থা এরূপ ছিল যে যাঁহারা উক্ত সমাজের পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁহারাও উহার সঙ্গে কেবল বাহ্য সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ উপদেশ শুনিতেন, কিন্তু উপদেশানুরূপ আচরণ করিতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্মের ব্রত-গ্রহণ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের নব-জীবন লাভ হইল"।[৩] এই নবীনীকৃত হিন্দুধর্মের তৎকালে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু। ব্রাহ্মসমাজ তখনও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। কিন্তু ভক্তিমার্গী দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শীঘ্রই জ্ঞানমার্গী অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ দেখা দেয়। দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী; এর বিরোধী চিন্তার প্রতিনিধি হলেন অক্ষয়কুমার। ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৭ সনে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই আভ্যন্তরীণ বিরোধ স্পষ্ট। বেণারসের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বেদের অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করলে ও অক্ষয়কুমারের সঙ্গে আলোচনার

---

* (২) রামমোহন রায়ের বহুমুখী দান বুঝবার জন্য—*Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations* (Calcutta, 1935) গ্রন্থখানি ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের রামমোহন বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

* (৩) বঙ্কবিহারী কর রচিত "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" গ্রন্থ (পৃঃ ৮ দ্রষ্টব্য)।

প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫০ সনে বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অক্ষয় দত্ত সংস্কার-বর্জিত হয়ে যতটা এগিয়ে যেতে চাইলেন, দেবেন্দ্রনাথ ততটা পারলেন না।[৪] এই আভ্যন্তরীণ মত-বিরোধের ফলে ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিনের জন্য হারিয়ে ফেলে তার গতিশীলতা। চলতে চলতে ব্রাহ্মসমাজ যেন খানিকটা নিশ্চল হয়ে পড়ে।

॥ ৫ ॥

এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে যিনি ব্রাহ্মসমাজকে আবার গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলেন, তিনি হলেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৫৭ সনে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁর সত্যকার নেতৃত্বে চলেছিল ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত। দেবেন্দ্রেনাথ প্রমুখ প্রবীণ নেতাদের তুলনায় তিনি ছিলেন আরও বেশী প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত। দেবেন্দ্রনাথ বললেন যা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো; কেশবচন্দ্র বললেন যা হয়েছে তাকেই চরম বলে মেনে না নিয়ে সম্মুখপানে আরো এগিয়ে চলো। যুবকদের মধ্যে প্রচার কার্য শুরু করে, সুদূর পল্লী অঞ্চলে ও বাংলার বাইরে ধর্ম প্রচার সংগঠন করে, 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্র প্রকাশ করে, ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার পর বক্তৃতা প্রদান করে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে এক অভিনব গড়ন দিতে সমর্থ হন। নতুন নতুন আদর্শ, কল্পনা ও সংস্কার-স্বপ্ন এই সময় ব্রাহ্মসমাজে দেখা দেয়। উপবীত বর্জন, ব্রহ্মোপাসনায় মেয়েদের অংশ গ্রহণ, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিরোধের পরিণতি দেখা দেয় ১৮৬৭ সনে। নবীনপন্থীরা মিলিত হয়ে কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় স্থাপন করলেন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" আর পুরাতন মত-পথের প্রতিনিধি ও সমর্থকেরা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সংগঠন করেন "আদি ব্রাহ্মসমাজ"। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপনের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় প্রখর ব্যক্তিত্বশালী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-জীবনে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব বা সৃষ্টিমূলক চাঞ্চল্য ব্রাহ্মসমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে বার বার লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। এই সৃষ্টিমূলক চাঞ্চল্যের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উক্ত সমাজের ইতিহাসে পাওয়া যায়

---

* (৪) ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি যাঁরা সংক্ষেপে জানতে চান, তাঁদের পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত —*Cultural Heritage of India* গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৯৩৭) সন্নিবেশিত ডঃ কালিদাস নাগের *"The Brahmo Samaj"* বিষয়ক রচনা বিশেষ মূল্যবান।

* (৫) ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনে ও বিবর্তনে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দান বঙ্কবিহারী করের "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" ও গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর "শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" পুস্তকে বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৮৪৪-৪৭ সনে — বেদ অভ্রান্ত কিনা — এই নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের বিরোধে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৮৬৩-৬৭ সনে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মতবিরোধে যার পরিণতি হলো "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন। আর তৃতীয় উদাহরণ হলো ১৮৭৮ সনে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" প্রতিষ্ঠার কাহিনী। আজকের যা প্রগতিবাদ বা বিপ্লববাদ তাই কালক্রমে হয়ে দাঁড়ায় মামুলি ধর্ম ও দর্শন। একযুগে যাঁরা প্রগতিবাদী তারাই আর এক যুগে রক্ষণশীল ও সনাতনী। প্রগতি বা বিপ্লবের শেষ নেই কোথাও। ১৮৬৭ সনের যুক্তি-পূজক ও প্রগতি-পন্থী কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই হারিয়ে ফেলেন তাঁর প্রথম যৌবনের উদারতা, যুক্তিনিষ্ঠা ও গতিশীলতা। কুচবিহারের রাজপুত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বঘোষিত আদর্শের সঙ্গে তাঁর আচরণের নিদারুণ অসঙ্গতি বহুজনের তীব্র আক্রমণের উপলক্ষ হয়। যাঁরা কেশবচন্দ্রের আচরণকে সমর্থন করতে পারলেন না ও নতুন নেতৃত্বের দাবি উত্থাপন করে এগিয়ে যেতে চাইলেন, তাঁরাই স্থাপন করলেন ১৮৭৮ সনে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ"। এর প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রধান।

॥ ৬ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে বাংলা দেশের উপর দিয়ে রকমারি চিন্তা ও সংস্কারের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এর একটি হলো "আদি ব্রাহ্মসমাজে"র ধারা— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যার প্রতিনিধি; দ্বিতীয় ধারা হলো "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"— যার প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র সেন; তৃতীয় ধারা "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" — যার প্রতিনিধি আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ১৮৭৮ সনের পর থেকে, ব্রাহ্মসমাজের এই ত্রিধারার মধ্যে যে অংশটা সক্রিয় ও সচল থাকে তা হলো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। অন্যান্য দু'টি অংশ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মোটের উপর একথা বলা অন্যায় হবে না যে, রামমোহন হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য যে নব আদর্শের সন্ধান দিয়েছিলেন — ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বাংলা দেশে এক প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে — সত্তর ও আশির দশকে তার প্রাণশক্তি যেন অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐ শতকের তৃতীয় পাদে ব্রাহ্মনেতাদের অর্থাৎ র‍্যাশন্যালিষ্ট ও মডার্নিষ্ট বাঙালী হিন্দুদের [৬] ধর্ম ও সমাজসংস্কারমূলক বিপুল প্রচেষ্টায় নব্যশিক্ষিত যুবকদের সাড়া ছিল সীমাহীন। কেশবচন্দ্র তখন যুবসম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা। কিন্তু সত্তর

(৬) "বিনয় সরকারের বৈঠকে", ২য় সংস্করণ, প্রথম ভাগ, ১৯৪৪, পৃঃ ৪১৩-২০ দ্রষ্টব্য।

ও আশির দশক থেকে দেশের মধ্যে এক জাতীয়তাবাদীর দল গড়ে উঠতে থাকে। জাতীয় সাহিত্য, হিন্দুমেলার কাজকর্ম, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় নাট্যাভিনয়, ''ভারত-সভা''র প্রতিষ্ঠা এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার ক্রমশই শিক্ষিত যুবকদের বেশি বেশি আকর্ষণ করতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন যে, সুরেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বিষয়ক অগ্নিময়ী ও উদ্দীপনাকারী বক্তৃতাবলীর ফলে যুবকেরা ১৮৭৫-৭৬ সনের পর থেকে ক্রমশই ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র অপেক্ষা রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের দিকে বেশি আকৃষ্ট হতে থাকে। রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে থাকেন, সাহিত্যে ক্ষেত্রে সেই আদর্শ, ভাব ও চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৭২ সনে 'বঙ্গদর্শনের' প্রতিষ্ঠা ও ১৮৭৬ সনে ''ভারত-সভার'' গোড়াপত্তন এদেশে জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ইতিহাসে দুই যুগ-নির্দেশক কীর্তি। জাতীয় ভাবের স্ফুরণ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার নতুন করে দেশের মাটি, দেশের জল, দেশের অতীত, দেশের সংস্কৃতি ও দেশের ঐতিহ্যকে ভালবাসতে শুরু করলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শের অনুকরণের যে-মোহ একদিন আমাদের পেয়ে বসেছিল, তাকে সাহসের সঙ্গে অস্বীকার করে নিজের ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার দিকে আমরা নজর দিলাম। আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে নির্বিচারে অস্বীকার বা উপেক্ষা করার দুঃসময় কাটতে আরম্ভ করলো।

॥ ৭ ॥

এই ''জাতীয়'' আন্দোলনকে যাঁরা রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল বিশেষণে চিহ্নিত করে থাকেন, তাঁদের দৃষ্টির মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও আবিলতা আছে যথেষ্ট। এই আন্দোলনের লক্ষ্য বিগত জীর্ণ অতীতকে ফিরে পাওয়া নয় — অতীতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও ঐশ্বর্য তাকে গ্রহণ করে নতুন-পুরাতনের সংমিশ্রণে জাতির জীবনকে সঞ্জীবিত করা। অনুকরণে জাতি বড় হয় না, অতীতকে নির্বিচারে অস্বীকার করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুষ্ঠুভাবে গড়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে জাতির অতীতকে অতিরিক্ত অস্বীকারের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশেষ করে কেশব সেনের পরবর্তী জীবনে ও আচরণে। দেশের অতীত ও ঐতিহ্যকে যথাযথ মূল্য দিতে যাঁরা সে সময় এগিয়ে এলেন, যাঁরা দেশের মাটি ও মানুষকে ভালবাসতে বললেন, তাঁরা অসাধারণ ধীশক্তি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের, শুধু আর্থিক পরিবেশের নয়, — স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, আর সেই

অভিব্যক্তিতে সংস্কারবাদী ব্রাহ্মসমাজের দানও যথেষ্ট। ক্রিয়া না হলে প্রতিক্রিয়া হয় না, কারণ না হলে কার্য হয় না। ব্রাহ্মসমাজের অতিরিক্ত উগ্র ও পাশ্চাত্যঘেঁষা সংস্কার-আন্দোলনের স্বাভাবিক ও সঙ্গত পরিণতি দেখতে পাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশে। এই আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ।

"There was yet another movement started about this time called the National. It was not fully political, but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality. It was a voice of impatience at the humiliation constantly heaped upon us by people who were not oriental ····· This contemptuous spirit of separatedness was perpetually hurting us and causing great damage to our own world of culture. It generated in our young men a distrust of all things that had come to them as an inheritance from their past ····· The same spirit of rejection, born of utter ignorance, was cultivated in other departments of our culture ····· The national movement was started to proclaim that we must not be indiscriminate in our rejection of the past. This was not a reactionary movement but a revolutionary one, because it set out with a great courage to deny and to oppose all pride in mere borrowings"। [৭] জাতির কাছে যাঁরা এই আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশ্রদ্ধার বাণী প্রচার করেন, তাঁরাও রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের মত এক নবযুগের প্রবর্তক। এই নবযুগের এক বিরাট প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় প্রতিনিধি সুরেন্দ্রনাথ, তৃতীয় প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, চতুর্থ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ।

॥ ৮ ॥

এই জাতীয়তার নবমন্ত্র শুধু সাহিত্য বা রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি-এই আদর্শের স্ফুরণ আমাদের ধর্মজগতেও লক্ষ্যণীয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এক যুগস্রষ্টা মহামানব—নব্যহিন্দু ধর্মের প্রবর্তক। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা অর্থাৎ "বর্তমান-নিষ্ঠ হিন্দু বাঙালী"-রা হাজার হাজার বছরের পুরাতন হিন্দুধর্মের যে-নয়া বা আধুনিক সংস্করণ রচনা করলেন, তার আবেদন শেষ পর্যন্ত থাকলো ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(৭) R. N. Tagore's essay on "*The Religion of An Artist*" as incorporated in the *Contemporary Indian Philosophy* (London, 1936) edited by J.H. Muirhead and S. Radhakrishnan.

আচারের আবর্জনা ও কুসংস্কার বাদ দিয়েও এবং খৃষ্টান-ধর্মের পথ না মাড়িয়েও প্রকৃত হিন্দুধর্মের সেবক থাকা যে সম্ভব, এই বোধশক্তি নব্যশিক্ষিত সমাজের ভেতর সঞ্চার করাই ধর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের সবচেয়ে বড় দান বলে মনে করি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতারা পরবর্তীকালে ক্রমশঃই নিজেদেরকে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ থেকে স্বতন্ত্র করে নিতে থাকেন। হিন্দুধর্মের সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তাঁরা শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সাধারণ নরনারীর সঙ্গে নিজেদের আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেননি। তাঁরা বুদ্ধির আভিজাত্যে নিজেদের ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজ-বহির্ভূত একটা স্বতন্ত্র দল বা সম্প্রদায় বলে ভাবতে লাগলেন। এই মনস্তত্ব ব্রাহ্মসমাজকে ক্রমশ রক্ষণশীল করে তোলে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে।

দ্বিতীয়তঃ, কেশবচন্দ্র সত্তর ও আশির দশকে ব্রাহ্মধর্মের নামে যে ভাব ও চিন্তা প্রচার করেন, তা খৃষ্টধর্মের নামান্তর বললেও দোষ হবে না। হিন্দুধর্মের সংস্কার বা ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের নামে তিনি যা ব্যক্ত করলেন তাঁর লেখায় ও ভাষণে, তার মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের অনুকরণ বা অনুসরণের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের *Swami Vivekananda* গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭-৫৮) এই বিষয়ের চমৎকার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র সেন সত্তর ও আশির দশকে ধর্মক্ষেত্রে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার মধ্যেই পুরাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে compromise বা আপসের লক্ষণ বর্তমান ছিল। নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তন, বৈষ্ণব ধর্মের দিকে অনুরাগ, রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ, অবতার-তত্ত্বে বিশ্বাস ও পরিশেষে ভক্তিমূলক "নববিধানের" প্রবর্তন ইত্যাদি ঘটনা এর প্রমাণ।

চতুর্থতঃ, ব্রাহ্মধর্মে সুপরিচিত হিন্দুধর্মের লোকাচার বর্জিত হয়েছিল। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর *Swami Vivekananda* গ্রন্থে (পৃঃ ১৬৩-৬৪) ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ যোগে দেখিয়েছেন যে, "The Brahmos rejected all the litanies, liturgies, rites and ceremonies of prevalent Hinduism. Their God was a non-anthropomorphic metaphysical expression yet put up as a personal one. They imported the God of the Unitarian Church of England and America in a Vedantic garb. Naturally, they suffer from the same defects as the Unitarian Church of the West. ..... The Brahmo Samaj created a void in the mind of the Hindus used to gorgeous rites and liturgies. Here is its trouble. An introduction of philosophical disquisition about transcendental

yet personal nature of Godhood cannot satisfy the minds of common men." ব্রাহ্মধর্মের আসল স্বরূপ হলো সুপরিচিত হিন্দুধর্মের লোকাচার বর্জন ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা। এর আদি উৎস উপনিষদে। উপনিষদের ব্রহ্মকে হিন্দুজাতি কোনদিনই উপাস্য বলে বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেনি। উপনিষদ-প্রচারিত ধর্ম ভারতের লৌকিক ধর্ম নয়; তা বুদ্ধিজীবীদের বা দার্শনিকদের ধর্ম হ'লেও হতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের তা ধর্ম হবার কোন যো ছিল না। বুদ্ধিজীবিদের পক্ষেও যেখানে নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনা করা কঠিন, সেখানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ঐ কল্পনার সার্থক প্রয়োগ আশা করা অনেকটা ইউটোপিয়ান স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ জনসাধারণকে স্বীকার করেই, তাদের বাদ দিয়ে নয়। সাধারণ রক্তমাংসের মানুষকে প্রথমেই অনেকগুলি অতিরিক্ত বা কাল্পনিক সদ্গুণের অধিকারী বলে ধরে নিয়ে তারপর নিজেদের কল্পনা ও আকাঙ্খা অনুযায়ী তাদের সাড়া না পেলে তাদের "common horde" বলে উপেক্ষা করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হ'লেও, বস্তুনিষ্ঠ বিচারে তা নেতৃত্বের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। সাকার না হলে নিরাকার হয় না, বস্তুকে বাদ দিয়ে আত্মার কোঠায় ওঠা যায় না, স্থূলকে একেবারে বর্জন করে সূক্ষ্মে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এ হলো সত্যের একদিক। আর একটা দিকও আছে আর তা হলো, মানুষ কল্পনায় আদর্শ সৃষ্টি করে, নিজেদের সৃষ্ট আদর্শকে ভালবাসে, বাস্তবে মর্মরমূর্তিতে রূপ দিয়ে তাকে পূজা করে। এ হলো মানুষের আদি বৃত্তি। একে অস্বীকার করে লাভ নেই। যে মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণায় আমরা গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বরের কোঠায় নিয়ে ঠেকিয়েছি, সেটা শুধু এদেশের জলবায়ুর প্রভাব নয়; অন্যান্য দেশের আবহাওয়ায়ও মহামানবদের এই দেবতা-প্রাপ্তি যোগ ঘটেছে। কনফিউসিয়াসকে মানুষ থেকে দেবতায় পর্যবসিত করতে চীনাদের প্রায় এক হাজার বছর সময় লেগেছিল; বুদ্ধকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের কমপক্ষে লাগে প্রায় পাঁচশ বছর। বীর-মানব বা মহামানবকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করা নিছক যুক্তিবাদের দিক থেকে সমর্থন না করা গেলেও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাকে অতি-প্রাকৃত, অস্বাভাবিক ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা চলে না। যুক্তিটাই মানবজীবনের সর্বস্ব নয়, ভক্তিটাও তার জীবনের মস্ত বড় দিক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে যে, বুদ্ধি-বিচার বা rationalism-এর থেকেও মানবজীবনের বড় অংশ হলো তার প্রবৃত্তি, কল্পনা ও আবেগ বা emotionalism। এই দুইয়ের সমন্বয়েই মানব জীবন গঠিত। নবযুগের যা ধর্ম হবে তার মূল ভিত্তি থাকবে জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিক বা সমন্বয়কারী দর্শনে। ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারবাদী নেতারা সে-যুগে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে সকলের

মধ্যে চালু করবার কর্মসূচী গ্রহণ করে ভুল করেছিলেন। দেশের জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মনেতাদের আত্মিক ব্যবধান তাঁদের সংস্কার আন্দোলনের গতিকে শিথিল ও দুর্বল করে তোলে।[৮]

॥ ৯ ॥

এই অপূর্ণতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের যে সকল নেতা উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে বিতৃষ্ণ বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁদের একজন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন এবং তদপেক্ষাও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল বিজয়কৃষ্ণের সংস্পর্শে বৈষ্ণবধর্মের দিকে আকৃষ্ট হলেন। শিশিরকুমার ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দের জীবনেতিহাসেও এই পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এঁদের পরবর্তী ধর্মজীবন ব্রাহ্মধর্মের অপূর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশেষ। এঁদের সকলেই নব্য হিন্দুধর্মের ও জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি। এই নবধারার শ্রেষ্ঠ রূপ আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে। তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধ সত্যের আলোকে ঘোষণা করলেন যে, সাকারও সত্য, নিরাকারও সত্য, বৈচিত্র্যও সত্য, ঐক্যও সত্য। তিনি বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান, শাক্ত ও বৈষ্ণব—সকলকেই জানালেন সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ, সত্যকে জানবার পথে সাধক বলে। কোন ধর্মই তাঁর কাছে উপেক্ষার বস্তু ছিল না—"যত মত, তত পথ"। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মের প্রজাতন্ত্রে রামকৃষ্ণের চেয়ে বড় প্রতিনিধি আর কেউ নন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম কী গৃহস্থ কী সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই ছিল সমভাবে গ্রহণের উপযোগী। কোন নির্দিষ্ট মতবাদের উপর, আচার-অনুষ্ঠানের উপর, বাহ্য বিধিনিষেধের উপর তিনি গড়েননি তাঁর ধর্ম; সকল ধর্মের মূলে নিহিত যে গভীর সত্য তার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন ঐক্য। দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, "যত মত, তত পথ"। মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অতুলনীয়। মানুষের ব্যক্তিত্বকে যথাযথ মূল্য ও গৌরব দিতে তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। ধর্মজগতের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা তাঁকে কখনো ভীত ও সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের বৈচিত্র্যে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলেই তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পেরেছিলেন ঃ হে শাক্ত, হে বৈষ্ণব, হে বৌদ্ধ, হে জৈন, হে হিন্দু, হে মুসলমান, হে খৃষ্টান—তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের নিজ নিজ ধর্মপথে স্বকীয় স্বাতন্ত্রের মাহাত্ম্যে

---

(৮) *Bande Mataram*, January 23, 1907 : vide the editorial on "*The Brahmo Samaj*". এই প্রসঙ্গে লেখকদের ***The Growth of Nationalism in India*** (কলিকাতা, ১৯৫৭) গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অগ্রসর হও; সত্যকে জানবার পথ হাজার রকমের।[৯] রামকৃষ্ণের ধর্ম ব্যাখ্যায় এই সজ্ঞান বহুত্বনিষ্ঠার স্বীকৃতি যে-কোন মানুষেরই হৃদয় আকর্ষণ করে। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। "His life was religion in practice" গান্ধীজীর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। রাজা রামমোহন রায় সমন্বয় সাধনার যে জ্যোতির্ময় পথ জাতিকে প্রদর্শন করেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন সেই পথের সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী অধিনায়ক। তাঁর চিন্তা ও বাণীর শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গ।

(৯) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঠিক স্বরূপ বিশ্লেষণ বিনয় সরকারের *Creative India* গ্রন্থে (পৃঃ ৪৬৪ ৭২ ও পৃঃ ৬৬৯-৮৮) ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের *Swami Vivekananda* পুস্তকে (পৃঃ ১৬০-৮৬) পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী" গ্রন্থখানিও পঠিতব্য।

পরিশিষ্ট (খ)

ডন সোসাইটি ও ভগিনী নিবেদিতা*

॥ ১ ॥

বাংলায় স্বদেশী যুগ (১৯০৫-১১) এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার দান ইত্যাদি বিষয়ের উপর ঐতিহাসিক গবেষণা আজকাল ক্রমশঃই বাড়তির দিকে। সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলনের উপর যে সকল গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে, তার মধ্যে শ্রদ্ধেয় গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ" (কলিকাতা, ১৯৫৬) গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আট শতাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই বইখানি লেখকের বহু বছরের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল। ১৮/১৯ বছর পূর্বে গিরিজাবাবুর "শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক রচনা 'উদ্বোধন' মাসিকে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময় অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় বলেছিলেন ঃ "অরবিন্দ'র জীবন-বৃত্তান্ত লেখা হচ্ছে। ফি বছরের ঘটনাগুলো দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেক মাসেই লেখক প্রায় বছরখানেকের খবর দিয়ে চলেছেন। জীবন-বৃত্তান্ত বা ইতিহাস লিখবার এই এক নতুন কায়দা। প্রত্যেক বছরকার বাঙালী জাতের বিভিন্ন আন্দোলন বিবৃত হচ্ছে। তার সঙ্গে এসে পড়ছে বিভিন্ন কর্মবীর আর চিন্তাবীরের জীবন-বৃত্তান্ত। হরেক রকমের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কব্জার ভেতর পাচ্ছি। গোটা বাঙালী জাতের ক্রমবিকাশ ধরা দিচ্ছে অরবিন্দর ক্রমবিকাশের আনুষঙ্গিকভাবে। ঐতিহাসিক গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নমুনা গিরিজাশঙ্করের 'শ্রীঅরবিন্দ'" ("বিনয় সরকারের বৈঠকে," ২য় সংস্করণ, প্রথম ভাগ, ১৯৪৪, পৃঃ ৭৪২)। উক্ত গ্রন্থে অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক জীবনের অভিব্যক্তির ধারাগুলি গিরিজাবাবু যে দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। তা ছাড়া বৃহত্তর স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর তিনি যেভাবে নতুন আলোকসম্পাত করেছেন, তাও বিশেষভাবে সম্বর্ধনাযোগ্য। অরবিন্দ প্রসঙ্গে গ্রন্থাকারের মন্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌলিক প্রামাণিক সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক অংশ আছে যা মৌলিক ও প্রামাণিক দলিলের সাহায্যে রচিত হয়নি—অন্য কোন গ্রন্থের সহায়তায় রচিত হয়েছে। গিরিজাবাবুর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ" বইয়ের ভুল-ক্রটি প্রধানতঃ এই অংশেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান রচনায় এইরূপ কয়েকটি ভুল-ক্রটির

* প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম 'দৈনিক বসুমতী'-তে (২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৭ সনে) প্রকাশিত হয়। তৎপর ৬ই জুন, ১৯৫৮ সনে ঐ একই রচনা ঐ পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়।

আলোচনা পাঠকের সামনে উপস্থিত করছি, বিশেষ করে ''ডন সোসাইটি'' সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে।

॥ ২ ॥

১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের পিছনে যে সকল প্রতিষ্ঠানের দান অতি উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি অন্যতম। এই ডন সোসাইটি সম্বন্ধে গিরিজাবাবুর আলোচনা পাওয়া যায় "শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক গ্রন্থে ও 'জয়শ্রী' মাসিকে প্রকাশিত "নিবেদিতা" নামক ধারাবাহিক রচনায়। উভয় স্থানেই গিরিজাবাবু ডন সোসাইটি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পরিবেষণ করেছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্পনারঞ্জিত, বিভ্রান্তিকর ও ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমের জন্য অবশ্য গিরিজাবাবুকেই সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। কারণ, ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা প্রসঙ্গে তিনি অনেক অনেক বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন ফরাসী লেখিকা লিজেল রেমঁ রচিত নিবেদিতা সম্বন্ধে "প্রামাণিক' (?) বইখানির ভিত্তিতে। ফরাসী লেখিকা রেমঁর গ্রন্থ কোন কোন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য হলেও উহা অনেক ক্ষেত্রেই প্রামাণিক নয়। ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা প্রসঙ্গে রেমঁ যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, শুধু সেই অংশটুকু পাঠ করলেই পক্ষপাতশূন্য পাঠক বুঝতে পারবেন যে, ইতিহাস রচনার নামে লেখিকা কীভাবে বিনা প্রমাণে একের পর এক ভুল তথ্য ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেষণ করে চলেছেন, আর যেখানে তিনি অধ্যাপক বিনয় সরকারকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সেখানে গোঁজামিল ছাড়া আর কিছু নয়। বিনয় সরকার ডন সোসাইটি সম্বন্ধে যে কথা কখনও বলেননি, বলতে পারেন না — এমন সব উদ্ভট কথা ডন সোসাইটি সম্বন্ধে ফরাসী লেখিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত বিষয়ে বিনয় সরকারের প্রামাণিক মতামত "বৈঠকে" নামক গ্রন্থে ও অন্যান্য ইংরেজী-বাংলা পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল পুস্তকে বিনয়বাবুর প্রদত্ত বিবরণ আর রেমঁ লিখিত "নিবেদিতা" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে বর্ণিত কাহিনী (পৃঃ ৪৩৫-৪৩৮) মূলতঃ স্বতন্ত্র। রেমঁ রচিত গ্রন্থের ভুল-ক্রটিগুলির পুনরাবৃত্তি গিরিজাবাবুর লেখায়ও বর্তমান। অবশ্য গিরিজাবাবু একমাত্র রেমঁকে ভর করে ডন সোসাইটি প্রসঙ্গে লেখেননি। কাজেই ঐ বিষয়ে তাঁর ভুল-ক্রটির জন্য রেমঁই সর্বাংশে দায়ী নন।

॥ ৩ ॥

রেমঁ-র অভিমতে ও গিরিজাবাবুর মতে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রেরণা পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) নিবেদিতা একটি নতুন মঠ স্থাপন করবার এক পরিকল্পনা তৈরী করেন। এই নতুন মঠে ছাত্রেরা বছরে ছয় মাস পর্যন্ত ধ্যানধারণা করবে আর বাকি ছয় মাস তারা বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করে জ্ঞান আহরণ করবে ইত্যাদি। স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট নিবেদিতা এই পরিকল্পনার কথা ২০শে জানুয়ারি, ১৯০৩ সনে এক পত্রে ব্যক্ত করেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় নিবেদিতার পরিকল্পনা আর কার্যকর হলো না। রেমঁ লিখেছেনঃ "এ পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকরী না হলেও সতীশচন্দ্র মুখুজ্যের কাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল কিন্তু ঐ থেকেই" (নারায়ণী দেবীর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ, ১৯৫৫, পৃঃ ৪৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য)। 'জয়শ্রী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সংখ্যায় (জুন, ১৯৫৩) গিরিজাবাবু নিবেদিতার ফরাসী চরিত থেকে অনুরূপ অংশটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে উদ্ধৃত করেছেন ঃ "This project of Nivedita could not be realised, but at every point it served as the basis of the work which Satis Chandra Mukherjee laid down soon ··· Mukherjee took it in hand, gave it a shape, a form, an aim — the possibility of offering to all its members a complete political education." রেমঁ-র গ্রন্থ থেকে গিরিজাবাবু এই উক্তি উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি আরও লিখেছেন ঃ "প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ভগিনী নিবেদিতা এই সোসাইটিতে যোগদান করেন" ('জয়শ্রী' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, পৃঃ ৯৯-১০০)। আবার "শ্রীঅরবিন্দ" পুস্তকেও গিরিজাবাবু নিবেদিতা কর্তৃক ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দেওয়া, সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাতে নিবেদিতার এসে যোগ দেওয়া, উক্ত সোসাইটিতে নিবেদিতা কর্তৃক "বিপ্লববাদ" (terrorism অর্থে) প্রচার ইত্যাদি কথা কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫ ও ৪৭৭ দ্রষ্টব্য)। এই সব ক্ষেত্রে ফরাসী লেখিকার মূল দুর্বলতা যেখানে, গিরিজাবাবুর বইয়ের দুর্বলতাও ঠিক সেখানে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থকারদ্বয় যথার্থ নির্ভরযোগ্য প্রমাণযোগে নিজ নিজ বক্তব্য দৃঢ়তর করতে অগ্রসর হননি। তাঁরা মন্তব্য করেই ক্ষান্ত থেকেছেন—মতামতের পেছনে প্রামাণ্য সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এবার এই সকল বিষয়ে আমাদের যা বক্তব্য তা উল্লেখ করছি।

॥ ৪ ॥

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিবেদিতার নিকট থেকে কোন "প্রেরণা" বা "পরিকল্পনা" পাননি। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সংস্কারমূলক পরিকল্পনা সতীশচন্দ্রের মাথায় ভর করতে থাকে নিবেদিতার ভারতবর্ষে পদার্পণেরও (১৮৯৮) বহু পূর্ব থেকে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার অসারতায় ও ব্যর্থতায় যে সকল মনীষী বিশেষভাবে অবহিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। অন্যান্য মনীষীদের ভেতর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ সনে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের সহায়তায় সতীশচন্দ্র ভবানীপুরে যে "ভাগবত চতুষ্পাঠী" স্থাপন করেন তা হলো ১৯০২ সনের জুলাই মাসে সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির আত্মিক পূর্বপুরুষ।

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রত্যক্ষ প্রেরণা আসে স্যার জর্জ বার্ডউডের লিখিত এক পত্র থেকে (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)। এই সময় সতীশচন্দ্রের সঙ্গে বার্ডউডের যে পত্রালাপ হয়, তা প্রণিধানযোগ্য। সতীশচন্দ্র স্বয়ং এই চিঠিখানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ও ঐ একই চিঠি তিনি দু-বার 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন (জুন, ১৮৯৯ ও অক্টোবর, ১৯০৯)।

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় সতীশচন্দ্রের জীবনে দ্বিতীয় প্রেরণা আসে ১৯০২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত লর্ড কার্জনের সমাবর্তন বক্তৃতা থেকে। ঐ বক্তৃতায় কার্জন যে সকল মন্তব্য করেন তা সতীশচন্দ্রকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে ('ডন' পত্রিকা, মার্চ, ১৯০২)।

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পেছনে তৃতীয় প্রেরণা ছিল র‍্যালে পরিচালিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাজকর্ম ও মতামত (জানুয়ারি-জুন, ১৯০২)। ১৯০২ সনের জুন মাসে কমিশনের রিপোর্ট ও রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "A Note of Dissent" প্রকাশিত হয়। এই সময় এদেশে এক তুমুল আলোড়ন দেখা দেয় ও কমিশনের রিপোর্ট তীব্র আক্রমণের বিষয় হয়। সতীশচন্দ্র এই আন্দোলনে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি শুধু আলোচনা ও সমালোচনাতেই নিজেকে আবদ্ধ করে না রেখে বাস্তব কর্মের পথেও অগ্রসর হন—জুলাই মাসেই প্রতিষ্ঠা করেন ডন সোসাইটি। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই সোসাইটির জন্ম। এখন পর্যন্ত নিবেদিতা সতীশ মণ্ডলের বহির্ভূত।

ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় যদি আর কেউ সতীশচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছেন বলে উল্লেখ করতে হয়, তবে যে দু'জনের নামোল্লেখ করা চলে তাঁদের একজন হলেন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশানের অধ্যক্ষ ও 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পত্রের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, আর একজন হলেন জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এর শিক্ষা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে দীর্ঘ ফতোয়া প্রকাশিত হয়, তাতে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম স্বাক্ষর ছিল ('ডন' পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৯০২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। সেখানে ভগিনী নিবেদিতার নামগন্ধও ছিল না। অথচ এই ফতোয়া প্রকাশিত হয় উক্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় ৫/৬ মাস পরে। যে-পরিকল্পনা রচনা করে নিবেদিতা সতীশচন্দ্রকে ডন সোসাইটি স্থাপনে "প্রেরণা" জোগান, তা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জানানো হয় ১৯০৩-এর ২০শে জানুয়ারির পত্রে। এই পরিকল্পনা অগ্রাহ্য হলে, অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারি, ১৯০৩ সনের পর—রেমঁ-র মতে ও গিরিজাবাবুর মতে —নিবেদিতা সতীশচন্দ্রকে ডন সোসাইটি স্থাপনে "প্রেরণা" ও "পরিকল্পনা" জোগান। অথচ ডন সোসাইটি তার অন্ততঃ সাত মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সগৌরবে কাজ করে চলেছিল। কাজেই ডন সোসাইটি স্থাপনে নিবেদিতার পক্ষে পূর্বোক্ত পরিকল্পনার সাহায্যে প্রেরণা দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

তা ছাড়া, আরও লক্ষ্যণীয় এই যে, ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি ১৯০৩-০৫ সনের মধ্যে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, তাতে সতীশচন্দ্রকেই ডন সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ("life and soul") বলে উল্লেখ বা ইঙ্গিত করেছেন। বক্তাদের কেহই একটি বারের জন্যও নিবেদিতার নামোল্লেখ করেননি। এমন কি স্বয়ং সতীশচন্দ্রও—যিনি নিজেকে সর্বদা নাম-যশের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন, যিনি অপরের সামান্যতম দানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে বারবার স্বীকার করেছেন, যিনি খানিকটা অকারণেই হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়কেও ডন পত্রিকার "Joint-Editor" বলে ও কিরণচন্দ্র বসুকে সোসাইটির শিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ("Founder") বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই সতীশচন্দ্র নিবেদিতার কাছ থেকে ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পাওয়ার বিষয়ে একবারও উল্লেখ করলেন না! ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকেই শ্রদ্ধেয় হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সতীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বস্তুতঃ এঁরাই ছিলেন প্রথম দিকে উক্ত সোসাইটির প্রধান প্রধান পাণ্ডা। এঁদের

দু'জনেরই সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদিতার কোনও যোগাযোগ ছিল না।

॥ ৫ ॥

তা'ছাড়া ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই যে নিবেদিতার ঐ সোসাইটিতে আসা-যাওয়া শুরু হয়, তাও সত্য নয়। আর নিবেদিতার এই সোসাইটিতে এসে যোগদান করা তো কোনদিনই ঘটেনি। ডন সোসাইটি স্থাপিত হবার অনেকদিন পরে,—প্রায় দু'বছর পরে, নিবেদিতা এই সোসাইটিতে আসেন ও বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ। ১৯০৪ সনের শেষের দিকে তাঁর ঐ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এই বিষয়ে 'ডন' পত্রিকার সাক্ষ্য ছাড়া হারাণবাবু ও রাধাকুমুদবাবুর সাক্ষ্যও বর্তমান। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা বিষয়ে যে আলোচনা আছে তারও মর্মার্থ অনুরূপ। গিরিজাবাবুর অর্থে নিবেদিতা কোনদিনই ডন সোসাইটিতে এসে "যোগদান" করেননি। নিবেদিতা নিমন্ত্রিত হয়ে অবশ্য মাঝে মাঝে এখানে বক্তৃতা দিয়েছেন। সেইরূপ বক্তৃতা তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও প্রদান করেছেন। কিন্তু দু-একটি বক্তৃতা দিলেই বুঝায় না যে, বক্তারা এসে সোসাইটিতে "যোগদান" করেছেন। এঁরা শেষ পর্যন্ত কেহই সোসাইটির ভিতরকার লোক ছিলেন না—বাহিরের সম্মানিত আগন্তুকমাত্র। নিবেদিতাও ঠিক তাই। ডন সোসাইটিকে "শতদল পদ্মের" সঙ্গে তুলনা করে গিরিজাবাবু লিখেছেন ঃ "নিবেদিতা বিদ্যাদায়িনীরূপে ঐ পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন।" এই ধারণা একান্তভাবেই কাল্পনিক ও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ডন সোসাইটির কেন্দ্রস্থলে ও মর্মমূলে যে ত্যাগী, তপস্বী ও শিক্ষাব্রতী দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি স্বয়ং সতীশচন্দ্র, অন্য কোন ব্যক্তি নন। ডন সোসাইটির কেন্দ্রস্থলে নিবেদিতা দণ্ডায়মান, এই অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্পনা গিরিজাবাবু কী করে করতে পারলেন তা জানতে চাইলে তিনি সুস্পষ্টভাবে কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

॥ ৬ ॥

আর একটি কথা। নিবেদিতা নিজে যাই হন ("Nihilist of the worst type"). তিনি ডন সোসাইটিতে অন্ততঃ কোন "বিপ্লববাদ" প্রচার করেননি। ফরাসী লেখিকা রেমঁ ও গিরিজাবাবুর মতে ডন সোসাইটিতে "একটা পুরাদস্তুর রাজনীতির পাঠ" (a complete political education) ছাত্রদের দেওয়ার "সম্ভাবনা ও ব্যবস্থা" ছিল। রেমঁ বিনা প্রমাণে এই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন,

গিরিজাবাবুও তাই নির্বিচারে মেনে নিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন। গিরিজাবাবু আরও লিখেছেনঃ "নিবেদিতা ডন সোসাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে কিছুই কসুর করেন নাই" ("শ্রীঅরবিন্দ," পৃঃ ৪৭৭)।

এই মতও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ডন সোসাইটি কোনদিনই রাজনৈতিক শিক্ষাদানের কেন্দ্র ছিল না। ছাত্রদের চরিত্র গঠন, স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ত্রুটিগুলির দূরীকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়েই এই সোসাইটি ১৯০২ সনে স্থাপিত হয়; পরে অবশ্য এর সঙ্গে শিল্প-বিভাগ ও পত্রিকা-বিভাগও খোলা হয়েছিল। ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতির শিক্ষা প্রদান করা সোসাইটির কর্মসূচী বহির্ভূত ছিল। প্রথম বছরের শেষে সোসাইটির পাঠাগারে প্রায় ১২০০ বই সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু এর ভেতর একখানিও রাজনীতি সংক্রান্ত বই নয়। দৈনিক পত্রিকা থেকে অবশ্য paper cuttings রাখবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সেখানেও সতীশচন্দ্র নিজে বাছাই করে ছাত্রদের পক্ষে প্রয়োজনীয় cuttings ই কেবল রাখতেন। ১৯০২ সনের ডিসেম্বর মাসের 'ডন' পত্রিকায় সোসাইটির কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে স্বয়ং সতীশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষ যে আলোচনা করেছেন তা এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

১৯০৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'ডন' পত্রিকা ডন সোসাইটির মুখপত্রে রূপান্তরিত হ'লে এর যে নতুন নামকরণ হয়, তা ছিল 'দ্য ডন অ্যান্ড ডন সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন'। এই সময় পত্রিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা হতো। দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বস্তু ছিল "Topics for Discussion"। এই অংশে সম্পাদক নিজের অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত আলোচনার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরতেন। রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা এখানেও সতীশবাবু সজ্ঞানে বর্জন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পর অবশ্য এই অংশে কখনও কখনও রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার জন্য স্থান পেতো। কিন্তু তা উগ্র রাজনীতি বা বিপ্লববাদ ছিল না। এমনকি স্বয়ং নিবেদিতাও কখনো ডন সোসাইটিকে বিপ্লববাদ (Terrorism) প্রচারের বাহনস্বরূপ ব্যবহার করেননি। তিনি সোসাইটিতে যে কয়টি বক্তৃতা প্রদান করেন বা 'ডন' পত্রিকায় তাঁর যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তা আমরা বিশেষ যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করে দেখেছি। সেগুলির মধ্যে কোথাও বিপ্লববাদের নামগন্ধও নেই। ঐ সকল বক্তৃতা ও রচনার মূল বিষয় ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ-তত্ত্ব, হিন্দুসমাজে নারীর স্থান ইত্যাদি। যদি এই সব বিষয়ে বক্তৃতা করা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করাকেই গিরিজাবাবু "সম্পূর্ণ রাজনীতি পাঠে শিক্ষাদানের

ব্যবস্থা" ও "বিপ্লববাদ প্রচার" বুঝে থাকেন, তবে ডন সোসাইটিতে ঐ ধরণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল —অন্য কোন অর্থে নয়।

ডন সোসাইটি নিবেদিতা-বাঞ্ছিত আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত প্রতিষ্ঠান ছিল না— উহা মূলতঃ সতীশচন্দ্রের ভাব ও আদর্শ অনুযায়ীই পরিচালিত হতো। ডন সোসাইটির নৈষ্ঠিক ভক্ত বিনয় সরকার সোসাইটিকে "a non-political institute of culture -nationalism" বলেছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রচারে সতীশচন্দ্রের মতো নিবেদিতাও ছিলেন একনিষ্ঠ ও শক্তিশালী প্রচারক। স্বার্থত্যাগ, স্বদেশনিষ্ঠা, দেশাত্মবোধ ইত্যাদির যে ভাব ও আদর্শ সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটির সদস্যদের নিকট প্রথম থেকেই সজ্ঞানে প্রচার করতে অভ্যস্ত ছিলেন, নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতা ও রচনার মাধ্যমে সেই সকল ভাবই সোসাইটির সামনে প্রচার করেন। এ বিষয়ে বিনয় সরকারের সাক্ষ্য ছাড়াও হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন গুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের সাক্ষ্যও বর্তমান। এঁরা সকলেই ডন সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ও কর্মী ছিলেন। এঁদের সকলেরই সুস্পষ্ট অভিমত হলো যে, ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা কোনদিনই বিপ্লববাদ প্রচার করেননি। ডন সোসাইটি সংক্রান্ত গবেষণায় দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা মোতায়েন আছি। এই সোসাইটির আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের বহু খুঁটিনাটি তথ্যও উদ্ধার করতে পেরেছি, কিন্তু নিবেদিতার এই সোসাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচারের সপক্ষে সামান্য নজিরেরও সন্ধান আমরা পাইনি; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্যই বিভিন্ন উৎস থেকে পেয়েছি।

অতএব আমাদের বক্তব্য হলো এই যে, "নিবেদিতা ডন সোসাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে কিছুই কসুর করেন নাই"—গিরিজাবাবুর এই অভিমত একটি নিছক কল্পনামাত্র। আর নিবেদিতা যদি সত্যসত্যই ডন সোসাইটিতে বিপ্লববাদ প্রচার করতে চেষ্টার ত্রুটি না করে থাকেন, তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় নিবেদিতার বিপ্লববাদ প্রচার একদম মাঠে মারা গিয়েছিল। কারণ, এই সোসাইটির নৈষ্ঠিক ভক্তবৃন্দ যেমন হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, কিশোরীমোহন গুপ্ত, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিনয় সরকার—সকলেই সতীশচন্দ্রের আদর্শ ও কর্ম প্রণালীতেই অনুরক্ত থাকলেন, অর্থাৎ নিবেদিতা-বাঞ্ছিত "বিপ্লববাদের" পথ মাড়ালেন না। ১৯৫৩ সনের মে মাসে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ সম্পাদিত 'ইতিহাস' ত্রৈমাসিকে আমাদের যে রচনা বের হয়, তাতে দেখানো হয়েছে যে, *terrorism* বা

সন্ত্রাসবাদের (অর্থাৎ গিরিজাবাবুর বর্ণিত বিপ্লববাদের) প্রতি সতীশচন্দ্রের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। দেশের স্বাধীনতা, স্বরাজের স্বপ্ন তাঁর চিন্তায় খুব উঁচু স্থান দখল করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা হলো নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ—বোমা বা বিপ্লববাদের পথ একেবারেই নয়। তৎকালে প্রকাশিত সতীশবাবুর অসংখ্য রচনা এর এক মস্ত বড় সাক্ষ্য বহন করে, আর তার থেকেও প্রামাণিক সাক্ষ্য হলো যাঁদের সামনে তাঁর শিক্ষাদান, সেই সকল ছাত্রদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি ও বিবরণ। স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রধান বিপ্লবী নেতা ও সন্ত্রাসবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাদের বলেছেন ঃ "তৎকালে আমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে ছিলাম উগ্রপন্থী। বিপ্লববাদীরা সতীশবাবুকে নিরামিষ রাজনীতির প্রচারক বলেই জানতো; ডন সোসাইটিতে বিপ্লববাদ কোনদিনই প্রচার করা হতো না।" সেকালের আর একজন প্রধান বিপ্লবী নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তাঁর মুখেও ঐরূপ উক্তিই পেয়েছি। সতীশচন্দ্র রাজনীতিতে বিভীষিকাগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে ছাত্রদের জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সপক্ষে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রগামী ভাবুক ও নায়ক। বাংলার বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংগঠনে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান অতি বিরাট। কিন্তু বিপ্লববাদের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের তিনি সমর্থক ছিলেন না এবং ডন সোসাইটিতেও বিপ্লববাদ সংক্রান্ত ভাবধারা কখনও প্রচার করা হতো না। বিপিন পাল ও অশ্বিনী দত্তের মতো সতীশচন্দ্র "বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাজনীতিতে চরমপন্থী নেতা" বলে সম্মানিত হতেন। 'বন্দেমাতরম' পত্রে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলীই এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

॥ ৭ ॥

গিরিজাবাবুর আর একটি ভ্রমাত্মক উক্তি হলো নিম্নরূপ ঃ "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ওপারে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শিবনারায়ণ দাসের গলির ভিতর একটি ছাত্রাবাস ছিল। সেই মেসের দোতলায় ছিল ডন সোসাইটি, আর একতলায় ছিল 'ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমী ক্লাব'। ('জয়শ্রী,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, পৃঃ ৯৯ ও "শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭৮)। এ-ধারণা নেহাৎ ভুল। এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ (ক) যে মেসের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, তার ঠিকানা ছিল ১৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। উক্ত মেস ১৯০৫ সনের জুন মাসে সতীশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের যৌথ চেষ্টায় কায়েম করা হয়। ঐ মেসে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রধান তিন

শিষ্য—রাধাকুমুদ, রবীন্দ্রনারায়ণ ও বিনয়কুমার—বাস করতেন। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন মেসের পরিচালক বা steward। পরে মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীও এখানে এসে যোগ দেন। কিন্তু এই মেস কোনদিনই মামুলি অর্থে "ছাত্রাবাস" ছিল না বা ডন সোসাইটির মেসও ছিল না। (খ) ডন সোসাইটির কার্যালয় প্রথম থেকেই অবস্থিত ছিল মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশানের অর্থাৎ বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের দোতলায়। ঠিকানা ছিল ২২নং শঙ্কর ঘোষ লেন। এই সামান্য একটি ঘটনা সম্বন্ধে ভুল বিবরণ থেকে আমাদের মনে আশঙ্কা হয় যে, ডন সোসাইটি প্রসঙ্গে গিরিজাবাবুর কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা অভিজ্ঞতা ছিল না। নচেৎ তিনি এই সোসাইটির অবস্থান সম্বন্ধেও ভুল সংবাদ লিখে রাখতেন না। তাঁর এই ভুলের প্রতি আমরা ইতিপূর্বেই আমাদের "এ ফেজ্ অব দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট" (কলিকাতা, আগষ্ট, ১৯৫৩, পৃঃ ৩৪) গ্রন্থে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

॥ ৮ ॥

ডন সোসাইটি প্রসঙ্গে গিরিজাবাবুর আর একটি বিভ্রান্তিকর উক্তি হলো ঃ "ডন সোসাইটি করিল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, সেই ভিত্তির উপর মন্দির উঠিলো জাতীয় শিক্ষার, সেই মন্দিরের প্রথম ও প্রধান পূজারী হইলেন অরবিন্দ। এই হিসাবে ডন সোসাইটির সহিত অরবিন্দের যে যোগাযোগ, তারই উপর নির্ভর করিয়া ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ মুখোপাধ্যায়কে অরবিন্দের বোমার মামলায় সাক্ষী পর্যন্ত দিতে হইয়াছিল" ("শ্রীঅরবিন্দ" পৃঃ ৪৭৫)। অরবিন্দের বোমার মামলায় সতীশবাবুর সাক্ষ্য দেবার বিষয়ে গিরিজাবাবু এখানে সম্পূর্ণ ভুল তর্ক-প্রণালী কায়েম করেছেন। অরবিন্দ ঘোষ বোমা মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে (১৯০৮-১৯০৯) সতীশচন্দ্রকে আলিপুর কোর্টে বিচারের সময় সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাক্ষ্য দিতে ডাকার কারণ সম্বন্ধেই আমাদের আপত্তি। ১৯০৮ সনের ২রা মে তারিখে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বহুপূর্বে ডন সোসাইটির অস্তিত্ব লোপ পায়। ডন সোসাইটির ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসাবে সতীশবাবুকে কোর্টে ডাকা হয়নি। আসল কারণ অন্যত্র। অরবিন্দ বোমার মামলায় জড়িত হবার সময় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে বহাল ছিলেন। আর সতীশচন্দ্র ছিলেন সে সময় উক্ত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও সুপারিনটেনডেন্ট। কাজেই ঐ কলেজের কোনো অধ্যাপক বোমার মামলায় জড়িত হলে অধ্যক্ষ ও সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে সতীশচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আদালতে হাজির হওয়া খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক পরিণতি। এই সামান্য তথ্যটুকুও খেয়াল

রাখলে গিরিজাবাবু অরবিন্দের বোমার মামলায় সতীশচন্দ্রের সাক্ষ্য দেবার বিষয়ে এমন ভুল তর্ক-প্রণালী প্রয়োগ করতেন না।

॥ ৯ ॥

"শ্রীঅরবিন্দ" পুস্তকের ৪৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় গিরিজাবাবু সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ডন' পত্রিকা ও 'ডন সোসাইটির' সন-তারিখ নিয়েও কিছু গন্ডগোল করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "১৮৯৩ সনে ডন পত্রিকার প্রতিষ্ঠা" ও "বিশ বৎসর ইহার পরমায়ু" অর্থাৎ ১৮৯৩ সন থেকে ১৯১৩ সন পর্যন্ত; আর ডন সোসাইটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসে "অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হইবার পর ডন সোসাইটির আর কোনই অস্তিত্ব থাকিল না।" গিরিজাবাবুর এই সকল মতামত নিজ গবেষণালব্ধ আবিষ্কার নয়—"বিনয় সরকারের বৈঠকে" প্রচারিত বিনয়বাবুর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র ('বৈঠকে', ১ম সংস্করণ, ১৯৪২, পৃঃ ২৫৯-৬০ ও ৩২১-২২ দ্রষ্টব্য)। 'বৈঠকে" বিনয়বাবু স্মৃতি থেকে সকল বিষয় আলোচনা করেছেন; কাজেই সন-তারিখের বিষয়ে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত 'ডন' পত্রিকা চালু ছিল, এরূপ উক্তি বিনয়বাবু "বৈঠকে" করেছেন ও "বৈঠকের" লেখকও তা'ই লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই বিবরণ সঠিক নয়। মূলতঃ "বৈঠকের" উপর নির্ভর করে লিখতে গিয়ে ডন পত্রিকা প্রসঙ্গে গিরিজাবাবুও ঐ একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন। ডন পত্রিকা ১৮৯৭ সনের মার্চ থেকে ১৯১৩ সনের নভেম্বর পর্যন্ত চলেছিল।

পুনরায় ডন সোসাইটি ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসেই "পঞ্চত্বপ্রাপ্ত" হয়নি—তার মেয়াদ চলেছিল এক অর্থে ১৯০৭ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত, কম-সে-কম ১৯০৭ এর মার্চ পর্যন্ত। ডন পত্রিকার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। 'ডন' পত্রিকা ও ডন সোসাইটি সম্বন্ধে আমাদের যা মূল বক্তব্য তা মৌলিকভাবে বিনয় সরকার বা 'বৈঠকে" রচয়িতার বিরুদ্ধে,—গিরিজাবাবুর বিরুদ্ধে আনুষঙ্গিকভাবে। কারণ, গিরিজাবাবুর ভুল অপরের বর্ণিত বিবরণের প্রতিধ্বনি মাত্র। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ঐ প্রসঙ্গে গিরিজাবাবুর রচনায় "বিনয় সরকারের বৈঠকে"র নামোল্লেখও করা হয় নি। সম্প্রতি প্রকাশিত "বাংলার সংস্কৃতি" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী "বাংলা গদ্য রীতি" (পৃঃ ৪২-৫১) নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে সকল মৌলিক মন্তব্য করেছেন (রবীন্দ্র গদ্য বোধিনিষ্ঠ না যুক্তিনিষ্ঠ ইত্যাদি বিষয়ক মন্তব্য; পৃঃ ৪৫-৪৮), তা "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১৯৪২, পৃঃ ২১৩-১৭) বিনয়বাবুর

যে তীক্ষ্ণ আলোচনা সন্নিবিষ্ট আছে, তার দুর্বল অনুকরণমাত্র। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, অনান্য বহু গদ্য লেখকের নামোল্লেখ "বাংলার সংস্কৃতি" গ্রন্থে থাকলেও বিনয় সরকার বা তাঁর কোন রচনার উল্লেখ পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থে নেই।

॥ ১০ ॥

'জয়শ্রী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ. ১৩৬০) "নিবেদিতা" শীর্ষক রচনায় গিরিজাবাবু লিখেছেন যে, ডন সোসাইটিতে রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও যদুনাথ সরকার মহাশয়গণ সদস্যদের নিকট বক্তৃতা প্রদান করতেন। এই তিনজনের কেহই একটিবারের জন্যও ডন সোসাইটির পথ মাড়াননি—বক্তৃতা দেওয়া তো দূরের কথা। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থে এই সকল নামের কোন উল্লেখ নেই। শ্রদ্ধেয় হারাণচন্দ্র চাকলাদার এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদের উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে ঐরূপ কথাই বলেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ডন সোসাইটিতে কখনও বক্তৃতা দেওয়ার বিষয়ে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন ও আমাদের ঐ ভুল সংবাদের প্রতিবাদ করতে বলেন। 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত সোসাইটি সম্বন্ধীয় তথ্যগুলিও এ বিষয়ের উপর আর এক প্রামাণিক সাক্ষ্য। গিরিজাবাবুর মতো ফরাসী লেখিকা রেমঁও তাঁর "নিবেদিতা" চরিতে এই ধরণের ভুল সংবাদ পরিবেষণ করেছেন। রেমঁ লিখেছেন ঃ "নামজাদা গুণীদের ভাষণ দেওয়ার জন্য ডাকা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন লোক-সঙ্গীত নিয়ে; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তারকনাথ দাস। কলকাতায় এসে রমেশচন্দ্র দত্তও 'জাতীয় জীবনের লক্ষ্য' নিয়ে ধারাবাহিক কতগুলো ভাষণ দিয়েছিলেন। গীতার উপরে ভাষণ দিতেন স্বামী সারদানন্দ। নিবেদিতা শুনতে যেতেন। ছেলেরা তাঁকে ঘিরে জানতে চাইত, 'কেমন লাগল।" (নারায়ণী দেবীর "নিবেদিতা" বিষয়ক বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৫) এই সকল উক্তির মধ্যে এক সঙ্গে অনেকগুলি ভুল ও গোঁজামিলের সমষ্টি দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু-একবার সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "লোক-সঙ্গীত নিয়ে" আর ব্রহ্মবান্ধব "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে" উক্ত সোসাইটিতে কোন বক্তৃতা প্রদান করেননি। তারকনাথ দাস, রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্বামী সারদানন্দ ডন সোসাইটিতে কোনদিনই বক্তৃতা দেননি—নিয়মিত বক্তৃতা প্রদান তো দূরের কথা। প্রামাণিক জীবন-চরিত বা ইতিহাস রচনার নামে কি পরিমাণ ভুল ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেষিত হতে পারে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাঠকগণ লিজেল রেমঁ-র "নিবেদিতা" চরিতে দেখতে পাবেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থকে

প্রামাণিক বলে মেনে নিয়ে এদেশের অনেক সুচতুর লেখকও যে ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছেন, গিরিজাবাবুর রচনা তার সাম্প্রতিক সাক্ষ্য বহন করছে। বিনয় সরকারের বিদুষী কন্যা ডঃ ইন্দিরা সরকারের মারফৎ ফরাসী লেখিকা রেমঁকেও তৎকালেই এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল।

পরিশিষ্ট (গ)

অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

(বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

আজকালকার ছাত্রসমাজের সঙ্গে বিগত যুগের শিক্ষাব্রতী মনীষীদের কোনও যোগাযোগ নেই বল্লেই হয়। কলেজের ছাত্রবৃন্দের কাছে দু'চারজন স্কলার বা 'প্রিন্সিপালের' নাম শুধুই জনশ্রুতি। কিন্তু যাঁদের দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ ধরণের শিক্ষা-সংস্কৃতির যুগান্ত হল, যাঁদের পাণ্ডিত্য, বিনয় ও সৌম্য চরিত্র সেদিনের ছাত্র-অধ্যাপক এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি, চরিত্র ও মননশীলতার কিছুটা পরিচয় না জানলে বর্তমান যুবসমাজ ঐতিহ্যের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গিরীশ বসু, হেরম্ব মৈত্র, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালগোপাল চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর দে, কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের দল যেভাবে বে-সরকারী কলেজে জীবন কাটিয়ে স্বদেশী শিক্ষার ধারাকে প্রভাবিত করে গেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এক একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে পীঠস্থানে পরিণত করেছেন, আধুনিক ছাত্রদের কাছে সে কাহিনী সুদূর স্মৃতি হ'লেও শিক্ষাপ্রদ।

অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এঁদের মধ্যে ছিলেন বয়সে নবীন। ১৮৮৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে তাঁর জন্ম ; ১৯৪৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর ষাট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। বাঙালী অধ্যাপকের পক্ষে তাঁর বয়স হয়েছিল বলতে হবে। যাঁরা তাঁকে নিকট থেকে দেখেছিলেন ও চিনেছিলেন, তাঁরা হয়তো আজও তাঁকে স্মরণ করেন ঃ 'কি চমৎকার মানুষ ছিলেন! এত পড়াশুনো ছিল কিন্তু কিছুই বোঝা যেত না!' কিন্তু সেই চমৎকারিত্বের পিছনে যে চরিত্রগুণ, যে ঋজু মন, যে ধৈর্য্য, যে প্রকাশবিমুখ অথচ আত্মসমাহিত দৃঢ়তা ছিল, কিছুদিন পরে হয়তো সে সব গুণের কথা মাত্র অলস কৌতূহল-কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে। তাই রবিবাবুর সম্বন্ধে কিছু তথ্য আগ্রহশীল শ্রোতার সাম্‌নে ধরতে পারা সৌভাগ্যই মনে করি।

ছাত্রজীবন থেকেই রবিবাবু মেধাবীত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছেন, পরীক্ষায় কৃতিত্ব তারই অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। তাঁর স্থিরবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি গুণই অধ্যাপক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পার্সিভ্যাল সাহেবের তিনি ছিলেন এক প্রিয় শিষ্য। শোনা যায়, বি-এ পরীক্ষার্থী রবিবাবু কলেজ টেস্ট

-এ ইংরেজী সাহিত্যের পেপারে মাত্র চারিটি প্রশ্নের উত্তর লিখে চৌষট্টির মধ্যে উনষাট নম্বর পান। বাকি দু'টি প্রশ্ন না লেখার জন্য পার্সিভ্যাল সাহেব নাকি ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে এক নম্বর কম দিয়ে সস্নেহ অনুযোগ করেন। অবসর গ্রহণের অনেকদিন পরে বিলেত থেকে যখন তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে চিঠি লেখেন, তখন তিনি বহুকাল আগে-দেখা তাঁর কৃতী ছাত্র রবীন্দ্রনারায়ণের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আজও তার '*strange insight into English literature*' এর কথা ভোলেননি। বি-এ পরীক্ষায় রবিবাবু ডবল অনার্স নিয়ে আপনার কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর চতুর্থ স্থান আর দর্শন সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি ঈশান স্কলারশিপ পেয়েছিলেন।

কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের অনুরাগী ছাত্র হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সময়টা রবিবাবু এমন এক আদর্শনিষ্ঠ পন্ডিত কর্মীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আসেন, যাঁর প্রভাবে তিনি স্বদেশী কর্ম-সূত্রে আবদ্ধ এবং ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির রক্ষণে উদ্যমী হন। তাঁর নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — যিনি বিখ্যাত 'ডন সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সব কৃতী ও সুশিক্ষিত যুবক একত্র হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবিবাবু নিজে, ডক্টর বিনয় সরকার, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক হারাণ চাক্‌লাদার মহাশয়ের নাম অনেকেই জানেন। সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ এঁরা মেনে নিয়েছিলেন, এবং তাঁর আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক সময় শিবনারায়ণ দাসের গলিতে একটি ছাত্রাবাসে একত্রে বাস করতেন। ১৯০৫ সনে রবিবাবু স্থির করেন যে সরকারী শিক্ষার সঙ্গে অসহযোগ করে সে বৎসর এম-এ পরীক্ষা দেবেন না। কিন্তু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশে ও সতীশবাবুর নির্দেশ উপেক্ষা করতে না পেরে মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং অনায়াসে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ঐ বৎসর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়, আর অধ্যক্ষ নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গন্ডি পেরিয়ে শুরু হলো রবিবাবুর সত্যিকারের ছাত্রজীবন এবং সেই জ্ঞান-চর্চা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর বছরখানেক আগে তাঁর দৃষ্টি ম্লান হয়ে গিয়েছিল; নইলে বই ও তিনি ছিলেন অবিচ্ছেদ্য সহচর।

এতদিন তিনি সাহিত্য-দর্শন নিয়ে কাটিয়েছিলেন, এইবার তিনি ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি আসক্ত হন। এর মূলে ছিল দু'টি প্রভাব। একটি হল সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ। অপরটি ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সঙ্গে রবিবাবুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এম-এ পাশ করেই তিনি এই স্বদেশী শিক্ষায়তনে যোগ দেন এবং ১৯১২ সন পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপনা করেন। একবার তিনি বলেছিলেন '*I began my career as a teacher of history*'। ইতিহাসের অনুরক্ত ছাত্র হয়ে কেন যে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ দেন আর ঐ বিষয় নিয়ে বরাবর অধ্যাপনা করেন, এ প্রশ্ন করাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন,— 'ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট'। তাঁর অনেক গুণী ছাত্র নিশ্চয় আজও মনে রেখেছেন তাঁর ইংরেজী সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, কবিতার উদার সুললিত আবৃত্তি, সাহিত্যের ওপর তাঁর স্বল্পবাক্ সূক্ষ্ম টিপ্পনী, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে মধ্যযুগের ও বর্তমান ইউরোপের ইতিহাস ও সমাজ-পদ্ধতি এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ও ব্যাপক ছিল। যাঁরা 'ডন' পত্রিকার পুরানো সংখ্যা দেখেছেন, তাঁরাই শুধু জানেন, রবিবাবু ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সমাজনীতি নিয়ে কি ধরণের মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এই প্রবন্ধগুলির মূল সূত্র এক ঃ - ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা এবং জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন। *Indian Nationalism and Indian Art; India's Literary Wealth; Indian Civilisation and Indian Nationalism* নামক প্রবন্ধগুলিতে তিনি অনেক পুরানো মালমসলা সংগ্রহ করে ভারতীয় সভ্যতার লৌকিক রূপটি উদ্ধার করেন। ১৯১২ সনের 'ডন' পত্রিকায় দেখি, রবিবাবু এই সময়ে ভারতীয় শিল্প শাস্ত্রে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র হয়ে পড়েন এবং সেই প্রসঙ্গে শিল্প শাস্ত্রের উপর রচিত মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ ও বিদেশী পণ্ডিতদের প্রামাণ্য বইগুলি সযত্নে অধ্যয়ন করেন। দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থ ও উত্তর ভারতীয় পুঁথিগুলি ছাড়া Oertel, Waddell, Haveli ও Coomarswamy প্রণীত রচনাগুলি পড়ে তিনি তিব্বতী পুঁথির সন্ধানে Foucher কৃত মূল ফরাসী এবং Dr. Grunwedel রচিত মূল জার্মান গ্রন্থ পড়তে শুরু করেন। এই গবেষণার ফলে তাঁর একটি বড় প্রবন্ধ লেখা হয় ঃ— '*Interpretation of Indian Art in the Light of Indian Literary Records : A new Branch of Study*'। এ প্রবন্ধটি পড়ে হ্যাভেল সাহেব বিলাত থেকে তার প্রশংসা করে চিঠি লেখেন। এ ছাড়া কুমারস্বামী রচিত '*On Indian Art in China*' নিবন্ধটি যখন

Dawn পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত, তখন তার ব্যাখ্যা করে টিপ্পনী লিখতেন রবিবাবু ও হারান চাকলাদার মহাশয়। এই সূত্রে ১৯১৩ সনে দিনাজপুর সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত তাঁর আর একটি রচনা 'সমাজে শিল্প ও সাহিত্যের স্থান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সে কথা বাংলা ভাষায় বোধ হয় এই সর্বপ্রথম বলা হয়।

বাংলায় যে ক' টি রচনা রবিবাবু প্রকাশ করেছিলেন, সবগুলিতেই তাঁর অধীত চিন্তা ও দর্শনের সমাবেশ, প্রাঞ্জলতায় ও প্রসঙ্গব্যাখ্যায় তাদের উজ্জ্বলতা লক্ষণীয়। 'প্রাচ্যের পরিচয়', 'আদর্শ বনাম বাস্তব' আর 'বঙ্গ সাহিত্য ও ভারত সাহিত্য' প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' কাগজে। প্রতিটি প্রবন্ধ স্বকীয় মননশীলতায় সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'পরিচয়' কাগজে রবিবাবুর একটি মাত্র প্রবন্ধ বেরিয়েছিল "প্রাচীন ও আধুনিক'। এ ছাড়া হীরেন মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আয়ুব সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনটি তিনি সযত্নে আলোচনা করেছিলেন উক্ত পত্রিকায়। যে সময়ে একাধিক সাহিত্য বিচারক আধুনিক কাব্যকে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন, সেই সময়ে তাঁর কলম থেকে এই উদারদৃষ্টি সমালোচনা যথেষ্ট মূল্যবান হয়েছিল। এগুলি ছাড়া, রবিবাবুর আরো কিছু স্বনামী ও বেনামী লেখা ছড়িয়ে আছে, যেগুলি প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্গে একত্র পুস্তকাকারে ছাপানো বাংলার শ্রদ্ধাশীল, আগ্রহবান পাঠকদের অবশ্য কর্তব্য দায়িত্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর একটি লেখা আছে *"The Eternal Wayfarer"*। দার্জিলিং-এও তিনি একটি সুন্দর অভিভাষণ দিয়েছিলেন *"Life and Letters in Mediaevel Bengal"*। Guizot-প্রণীত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস তিনি বাংলায় তর্জমা করেন এবং সেই সার্থক অনুবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করেন, এ কথা অনেকেই জানেন। আর একটি খবর হয়ত সবাই জানেন না যে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর যখন রোগশয্যায় তখন তিনি বৈদিক যজ্ঞকথা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি মুখে মুখে অনেক কথা বলে যেতেন আর রবীন্দ্রনারায়ণ সেগুলি সাজিয়ে ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

রবিবাবুর কর্মজীবন বৈচিত্র্যহীন, যেহেতু তিনি অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১২ সনে তিনি রিপন কলেজে যোগ দেন এবং কিছুকাল পরেই অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের তৎপরতায় সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি পরে কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯১৭ সনে তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে আবার সেই পুরানো কলেজেই ফিরে আসেন। প্রথমে উপাধ্যক্ষ এবং শেষ বারো বছর অধ্যক্ষপদে রবিবাবু প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আর তাঁর সময়ে এই কলেজ বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে অগ্রণীস্বরূপ হয়েছিল। খেলাধূলায়, পরীক্ষার ফলে ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং রবিবাবুরই কার্যকারিতায় বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক ও সাহিত্যিক রিপন কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রবিবাবু অত্যন্ত সাধাসিধে, ঢিলে-ঢালা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। স্বভাবতঃ স্বল্পবাক্, সংযত ও গম্ভীর এই পুরুষ বহুকাল বিপত্নীক ছিলেন। ইদানিং তাঁর একমাত্র পুত্র বিয়োগের পর থেকে তিনি যেন আরও উদাসীন ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। জীবনে ক'টি নেশা তাঁর প্রবল ছিল, পান খাওয়া, ফুটবল খেলা দেখা, আর গান-বাজনা শোনা। ভাল গানের আসরে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত, আর ফুটবল খেলা কবে যে তিনি দেখেননি তা জানা নেই। বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করে খেলার মাঠে উপস্থিত হওয়া তাঁর কাছে ছিল নিত্য কর্মপদ্ধতি। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে ভাল ম্যাচের দিন তিনি যে রকম তরুণ-সুলভ উদ্যম ও কৌতূহল নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতেন, সে এক কৌতুকের ব্যাপার। তাঁর চরিত্রে দু'টি বিপরীত ধর্ম ছিল। একদিকে স্বাভাবিক আলস্য, অপর দিকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রগাঢ় অনুরাগ ও উদ্যম। একদিকে তিনি গুণগ্রাহী, মিষ্টভাষী, সামাজিক। অপরদিকে তিনি বীতস্পৃহ, উদাসীন। সংসারে থেকে, বিশেষ করে এত বড় একটি কোলাহলমুখর শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি যে কেমন করে অমন নিরাসক্ত, ধীর ও স্থিরমস্তিষ্ক থাকতে পেরেছিলেন এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু কূর্মনীতি অনুসরণ করলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বলিষ্ঠ। সময়োচিত দৃঢ়তা অবলম্বন করতে তিনি পশ্চাৎপদ হতেন না। জীবনে তিনি অনেক বিখ্যাত গুণীজনের নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং প্রত্যেকের কাছেই চরিত্রে ও জ্ঞানে খাতির পেয়েছিলেন। তিনি সত্যই ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ ভদ্র পুরুষ — যাঁর অচল স্থৈর্য ও সুকুমার আচরণের কাছে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ মাথা নত করত।

সারাজীবন তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেই কাটালেন, কিন্তু নিজের পাণ্ডিত্যের তুলনায় এমন কিছু লিখে যাননি যা থেকে পরবর্তী বিদগ্ধ সমাজ তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পেতে পারে। তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি যদি কোনদিন একত্র প্রকাশিত হয়, তবে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে এই পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট (ঘ)

জ্ঞানতাপস হারাণচন্দ্র চাকলাদার

(উমা মুখোপাধ্যায়)

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার গত ১৯৫৮ সনের ১৯শে জানুয়ারি কলিকাতায় তাঁর শ্রীমোহন লেনস্থ্ বাসভবনে ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে কয়জন স্বদেশানুরাগী ও জ্ঞানতপস্বী বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অধ্যাপক চাকলাদার ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

হারাণচন্দ্র ফরিদপুর জেলার দক্ষিণপাড়া নামক স্থানে ১৮৭৪ সনে এক দরিদ্র তালুকদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হ'লে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেন। একবার বাল্যবয়সে আগুনে তাঁর সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল। সে সময় শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষের চিকিৎসায় তিনি নিরাময় হয়েছিলেন। যৌবনে তিনি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সদগুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পদমূলেই ১৮৯৪ সনে গোঁসাই-এর অন্যতম প্রধান শিষ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ক্রমশ গভীর আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তাঁদের দু'জনের নিকট-আত্মীয়তার বন্ধন আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৮৯৬ সনে বি,এ এবং ১৮৯৭ সনে এম,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হারাণবাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগীরূপেই প্রথম কর্মমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্বেই সতীশচন্দ্র প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার ত্রুটি ও অপূর্ণতা দূর করে এক সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্ত বিবিধ গঠনমূলক কাজ শুরু করেছিলেন। হারাণবাবুর মত একনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ শিক্ষাব্রতীকে সমকর্মীরূপে পাওয়ায় সতীশচন্দ্রের আরব্ধ কাজে যে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের জন্য সতীশচন্দ্র স্থাপন করেন 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী' (১৮৯৫), ও প্রতিষ্ঠা করেন 'ডন' পত্রিকা (১৮৯৭)। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও ইতিহাসের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ভারতের বিরাট ঐতিহ্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার ব্রত গ্রহণ করেছিল সতীশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী'। সেই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্ররূপেই 'ডন' মাসিকের আত্মপ্রকাশ। উভয়ের সঙ্গেই হারাণবাবু সুজড়িত ছিলেন গোড়া থেকে। তিনি 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী'র একজন প্রধান আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং সেখানে তিনি পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের নিকট সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র

অতি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে তিনি যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার গোড়াপত্তন এই চতুষ্পাঠীর আবহাওয়ায় হয়েছিল বললে ভুল হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে সতীশবাবুর কোন কোন বন্ধু-পরিবারের ছেলেদেরকে আদর্শ শিক্ষাদানের জন্য হারাণবাবুও সতীশচন্দ্রের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে গৃহ-শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। সতীশবাবুই তাঁর জন্য এই সময় কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিসে একটি চাকরি জোগাড় করে দেন।

প্রথম থেকেই হারাণবাবু 'ডন' পত্রিকার নিয়মিত লেখক গোষ্ঠীভুক্ত হন। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৩ সনের মধ্যে 'ডনে' প্রকাশিত "স্বরাজ্যসিদ্ধি" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলি ভাস্করানন্দ স্বামীর "স্বরাজ্যসিদ্ধি" নামক বেদান্ত বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য সহযোগে ইংরেজী অনুবাদ। তেত্রিশটি সংখ্যায় সমাপ্ত এই প্রবন্ধগুলি (একটি ছাড়া) পণ্ডিত দুর্গাচরণ ও হারাণচন্দ্র কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। এই সময়ে 'ডনে' প্রকাশিত আর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের নাম "From the Lips of a Saint" (১৮৯৮—১৯০৩)। প্রবন্ধগুলি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশাবলীর সারাংশের ইংরেজী অনুবাদ। এই অনুবাদের কাজেও হারাণচন্দ্র এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

১৯০২ সনে ডন সোসাইটি স্থাপিত হ'লে হারাণবাবু ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন নৈষ্ঠিক কর্মী ও সেবক হলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল চিন্তা এতদিন সতীশচন্দ্রের মাথায় ঘর করেছিল, ডন সোসাইটি হলো তারই বাস্তব অভিব্যক্তি। এই সোসাইটির বিভিন্ন বিভাগে — সাধারণ, শিল্প ও পত্রিকা — হারাণবাবু ছিলেন সতীশচন্দ্রের নিত্য সহকর্মী। শিল্পবিভাগ তত্ত্বাবধানের প্রধান দায়িত্বই থাকত তাঁর উপর। বিভিন্ন স্থান থেকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করে টাকা প্রতি এক আনা লাভে ঐ সকল দ্রব্য ছাত্রসমাজের নিকট বিক্রি করা হ'তো। লভ্যাংশ জমা হ'তো সোসাইটির ফাণ্ডে। ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'ডন' পত্রিকা ডন সোসাইটির মুখপত্রে পরিণত হয়। 'দেশকে ভালবাসতে হ'লে দেশকে জান' এই ছিল তখন পত্রিকার আদর্শ। জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী শিল্প, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, কীর্তি ও কলা এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জনপদের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত স্থানলাভ করতে থাকে এই পত্রিকায়। "বৈঠকে" বিনয় সরকার বলেছেন ঃ "পাঠকদেরকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হরেক-রকম বৃত্তান্ত, তথ্য আর সংখ্যা মুখস্থ করানোই ছিল যেন সতীশবাবুর মতলব। এই মতলব-মাফিক প্রবন্ধ লেখার ভার ছিল প্রধানতঃ হারাণ চাকলাদারের হাতে।

হারাণবাবুকে দেখতাম নিত্য-নৈমিত্তিকভাবে সেন্সাস রিপোর্টগুলো পড়তে আর তা'ই থেকে মাল নিয়ে প্রবন্ধ লিখ্‌তে' (পৃঃ ২৬৫)। এখানে সেন্সাস রিপোর্ট পড়া সম্পর্কে যে মন্তব্য বিনয় সরকার করেছেন তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করি হারাণচন্দ্রের 'Fifty Years Ago : The Woes of a Class of Bengal Peasantry under European Indigo Planters' (জুলাই, ১৯০৫) শীর্ষক নীলকর আন্দোলন-বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধে। এছাড়া তাঁর অন্য যে-কয়টি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক লেখা এই সময় 'ডন' পত্রিকায় বের হয়, তার মধ্যে 'Maritime Activity and Enterprise in Ancient India : Intercourse and Trade by Sea with China' (১৯১০-১৯১২, রয়্যাল সাইজ্ ম্যাগাজিনের ৬৮ পৃঃ), "Ship-building and Maritime Activity in Bengal" (১৯১০-১৯১২; ৪২ পৃষ্ঠা) এবং "Bengali as Spoken by the Bengalees" (১৯০৪-১৯০৬; ৫৭ পৃষ্ঠা) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁর একদিকে যেমন ছিল তথ্যের প্রাচুর্য, তেমনি আবার ছিল বিশ্লেষণী শক্তি। তথ্যের সমাবেশে ও বিশ্লেষণী ক্ষমতায় তিনি একদিকে দিয়েছেন তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়, অন্যদিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন নূতন নূতন মত ও চিন্তার ধারা। তাঁর "Bengali as Spoken by the Bengalees" প্রবন্ধটি সে-সময় পোপৎলাল গোবিন্দলাল শা, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি অবাঙালী পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। "Maritime Activity in Ancient India" প্রবন্ধের উপর উল্লেখযোগ্য মন্তব্য বের হয় 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র' সম্পাদকীয় স্তম্ভে (আগষ্ট, ১৯১০)। "Maritime Activity in Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধ নিয়ে তৎকালে লেখকের সঙ্গে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল 'ডন' পত্রে। বলা বাহুল্য প্রাচীন ভারত ও বৃহত্তর ভারত সম্পর্কীয় এই সমস্ত প্রবন্ধই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ণধার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুপ্রাণিত। বিনয় সরকার ''বৈঠকে' বলেছেন ঃ ''গ্রেটার ইণ্ডিয়া বিষয়ক ঐতিহাসিক কল্পনা সতীশবাবুর মগজে প্রথম ঠাঁই পায়'' (পৃঃ ৩২২)। প্রধানতঃ তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও পরিচালনায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের দুইজন অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বৃহত্তর ভারত-বিষয়ক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এছাড়া, "Darkest India" প্রভৃতি হারানচন্দ্রের কয়েকটি নৃতত্ত্ব-বিষয়ক লেখাও 'ডনে' প্রকাশিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ (মার্চ, ১৯০৬) স্থাপিত হ'লে হারাণবাবু সতীশচন্দ্রের সহযোগীরূপে সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে

যৎসামান্য বেতনে ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন ও শিক্ষা-পরিষদের সংগঠন কার্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন ন্যাশন্যাল কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক, শিক্ষা-পরিষদের সহ-সম্পাদক ও ন্যাশন্যাল কলেজের সহ-তত্ত্বাবধায়ক।

১৯১০-১১ সনে স্বদেশী আন্দোলন কতকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং জাতীয় শিক্ষা-পরিষদেও কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় হারাণবাবু ন্যাশন্যাল কলেজের কাজ ছেড়ে শিবপুর এইচ, সি, ই, স্কুলে (বর্তমান দীনবন্ধু হাই স্কুলে) বছর দুই হেডমাষ্টারী করেন (১৯১১-১৩); তৎপর রিপন কলেজে দুই বৎসর (১৯১৩-১৫) অধ্যাপনার পর তিনি বিহার ন্যাশন্যাল কলেজে চাকরি গ্রহণ করেন (১৯১৫-১৭)। এরপর আবার রিপন কলেজে মাসকয়েক কাজ করবার পর (আগষ্ট, ১৯১৭—জুন, ১৯১৮) ১৯১৮ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যয়ের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরে নৃতত্ত্ব বিভাগে পঠন-পাঠন শুরু হ'লে উক্ত বিভাগেও তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপকরূপেই তিনি ১৯৩৭ সনে অবসর গ্রহণ করেন।

বিহার ন্যাশন্যাল কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন হারাণবাবুর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গবেষণা ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ সনে পাটনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে তিনি "পাটলীপুত্র" নামে যে বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ লেখেন, তা যথাক্রমে 'মানসী ও মর্মবাণী' এবং 'মর্ডান রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজী প্রবন্ধটি বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের এক সভায় পঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল। এখানেই জয়সোয়ালের সঙ্গে হারাণবাবুর প্রথম পরিচয়। এই প্রাথমিক পরিচয় অতি অল্পদিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। জয়সোয়াল যখন ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরির হাতীগুম্ফা শিলালিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টায় রত, হারাণচন্দ্র সে সময় দিনের পর দিন তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে এই বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করেন। হারাণবাবুর নিকট তাঁর এই ঋণ জয়সোয়াল তাঁর হাতীগুম্ফা শিলালিপি সম্পর্কিত গবেষণামূলক রচনায় উল্লেখ করেছেন (J. B. O. R. S.-এ জয়সোয়ালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। 'জার্নাল অব বিহার এণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি'তে হারাণচন্দ্রের "বাৎস্যায়নের তারিখ" সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধও এই সময় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটি পরিবর্দ্ধিতআকারে স্যার আশুতোষের

"জুবিলী কমেমোরেশান্ ভলিউম"-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি কালিদাসের তারিখ সম্পর্কে তাঁর মতামত অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে হারাণবাবু জয়সোয়াল ও ভাণ্ডারকারের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের পাঠক্রম রচনায় এবং উক্ত বিভাগ সংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের পরিবেশে ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যিনি ইতিপূর্বেই এই বিষয়ে বিস্তর চিন্তা ও গবেষণা করেছিলেন, তাঁর সেই গবেষণালব্ধ ফল যে পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় সার্থকভাবে পরিবেষিত হয়েছিল, তা বিশেষ গৌরবের বিষয়। স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগীয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার সপক্ষে যে বক্তৃতা করেন (১৯১৯-২০), তাতে তিনি হারাণবাবুর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে হারাণচন্দ্র যে সকল সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান : *(1) Studies in the Kamasutra of Vatsyayana (Calcutta., 1925); (2) Social Life of Ancient India : Studies in the Kamasutra of Vatsyayana (Calcutta., 1929; Greater India Society Publication No. 3); (3) Aryan Occupation of Eastern India in Early Vedic Times (Calcutta, 1925, printed in part); (4) Social Life in Ancient India – a lengthy paper published in the 'Cultural Heritage of India,' (Vol. III, 1937); (5) Presidential Address on 'Problems of the Racial Composition of the Indian Peoples'* (১৯৩৬ সনে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রিবিংশতি অধিবেশনে নৃতত্ত্ব বিভাগের সভাপতিরূপে পঠিত এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত); *(6) The Pre-historic Culture of Bengal — Man in India* নামক নৃতাত্ত্বিক পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত); (7) দক্ষিণ ভারতীয় শিলালিপির উপর দুইটি প্রবন্ধ ('ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল্ কোয়াটারলি', ১৯২৭-২৮)। এছাড়া, তাঁর আরও অনেক গবেষণামূলক ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

হারাণচন্দ্র চাকলাদার বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি ও গুরুমুখী ভাষা ছাড়াও তিনি জার্মান ও ইতালিয়ান ভাষা জানতেন এবং তাঁর প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণায় তিনি মূল জার্মান গ্রন্থ ব্যবহার করতেন।

পরলোকগত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষের জার্মানি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল হারাণবাবুর কাছেই। জার্মান পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গের "কাস্ট-সিস্টেম অব ইণ্ডিয়া" তিনি মূল জার্মান থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে 'ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারী'-তে প্রকাশ করেন। ইতালিয়ান পণ্ডিত V. Giuffrida Ruggeri'র *'The First Outlines of A Systematic Anthropology of Asia'* বইখানি হারাণবাবু স্যার আশুতোষের অনুরোধে ইতালিয়ান ভাষা শিখে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ *Journal of the Department of Letters, Vol. V*-এ এবং পুস্তকাকারে (১৯২১) প্রকাশিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়।

হারাণবাবু ঋগ্বেদের তারিখ সম্বন্ধে সুপ্রচলিত মতবাদ স্বীকার করেননি। এই বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জীবনের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করেছেন। সে আজ ১৯৫২-৫৩ সনের কথা। বার্ধক্যবশত ক্ষীণদৃষ্টি ও দুর্বল শরীর তাঁর তখন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন অনেক সময়ই নিজের হাতে লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাতেও তাঁর জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বিন্দুমাত্রও কমেনি। সে সময় আমি কিছুদিন তাঁকে গবেষণার কাজে সাহায্য করেছিলাম। তিনি মুখে যা বলে যেতেন তা'ই আমি লিপিবদ্ধ করতাম। আমাকে দিয়ে Gordon Childe, Wheeler প্রভৃতি পণ্ডিতের হালে প্রকাশিত পুস্তকাদি আনিয়ে তার মালমশলাও তিনি ব্যবহার করেছেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বহুদিন তিনি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে গিয়েছেন তাঁর নির্দেশানুযায়ী পুস্তকাদি থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে দেবার জন্য। প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধের এই সুতীব্র জ্ঞানস্পৃহা দেখে আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। দুর্ভাগ্যের কথা এই বই-এর পাণ্ডুলিপি এপ্রিল ১৯৬০ সন পর্যন্তও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

হারাণবাবুর আর একটা প্রধান কাজ হলো শিখ ধর্মপুস্তক "গ্রন্থ-সাহেব" এর টীকা-টিপ্পনীসহ গুরুমুখী থেকে বঙ্গানুবাদ। এর প্রথম খণ্ড ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত হয়েছে। বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে হারাণবাবু এই মহান কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন।

পরলোকগত হারাণচন্দ্র চাকলাদার কেবল যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তা নয়। স্বদেশ-সেবার আদর্শ সামনে রেখে, নাম-যশপরাভস্মুখ হয়ে তিনি আজীবন জ্ঞানচর্চা ও আধ্যাত্ম-সাধনা করে গিয়েছেন। আমরা প্রাচীনকালের জ্ঞান-সাধক মুনি-ঋষির কথা অনেক শুনে থাকি; হারাণবাবুকে দেখে তাঁদের ছবিই সর্বদা মনে

ভেসে ওঠে।

শেষ কথা। পঞ্চাশের দশকে আমি ও আমার স্বামী সতীশচন্দ্র ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে যখন গবেষণায় লিপ্ত ছিলাম, তখন হারাণবাবুর কাছ থেকে শুধু বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য ও অজানা তথ্যই আমরা আহরণ করিনি, তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম গবেষণার অফুরান প্রেরণা ও সুচিন্তিত নির্দেশ। ১৯৫৭ সনে আমাদের *The Origins of the National Education Movement* নামক গ্রন্থখানি ছাপা হচ্ছিল। মুদ্রণের প্রত্যেকটি স্তরে আমরা তাঁকে ফাইল কপি দেখিয়ে আস্‌তাম। ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সনে ঐ বৃহদাকার গ্রন্থের দুইখানি বাঁধাই কপি আমাদের হস্তগত হয়। পরদিন বিকালে (২৩.১২.৫৭) *The Origins* বইয়ের একটি কপি হারাণবাবুকে দেবার জন্য আমি তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে যাই। তাঁর হাতে বইখানি তুলে দিতেই তিনি বইখানি মাথায় ঠেকিয়ে আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, "আমি এই বইটি দেখবার জন্য কতদিন ধরে অধীর আগ্রহে বসে আছি!" তাঁর দু'চোখ বেয়ে তখন ঝরঝর করে জল পড়ছিল—আনন্দাশ্রু। আমার মাথায় সস্নেহে আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে দিয়ে আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে পাঠালেন অনাবিল আশীর্বাদ। এটাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এর অল্পদিন পরেই সংবাদ পেলাম তিনি ইহলোক ত্যাগ করে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। অশ্রুতে আমার চোখ ভরে গেল।

পরিশিষ্ট (ঙ)
আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা ডক্টর সুরেন দাশগুপ্তের প্রথম পত্র

100, Russa Road,
(2nd Floor)
Kalighat
Calcutta
8.1.43

পরম পূজনীয়েষু,

আপনার আমাকে মনে আছে কি না জানি না। আনুমানিক ১৩০১ কি ১৩০২ সনে যখন আমার বয়স ছয়-সাত বৎসর হইবে সেই সময় আপনার সহিত শ্রীশিবনারায়ণ পরমহংসজীর আশ্রমে দেখা হয়। তারপর কালীঘাটে কালিদাস পতিতুন্ডির লেনে আমার বাসায় আপনি অনেকবার আসিয়াছিলেন ও আপনার সহিত রাখাল রায়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ বাসায় অনেকবার শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সহিত দেখা করিতে যাই। ঐ সময়ে দ্বিতীয় দিন যখন আপনি আমার কালীঘাটের বাসায় আসেন তখন আমাকে একটি কুরুভাইজার ঘড়ি দিয়াছিলেন। আপনি বোধ হয় তখন জলটুঙ্গির নিকট জজ দ্বারিক মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর নিকটে একটি বাড়ীতে থাকিতেন। সেখানেও আপনার সহিত ২/১ বার সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ইংরাজী 'হোপ', 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'সুলভ দৈনিক' প্রভৃতি পত্রিকায় 'অদ্ভুত বালক' বা 'খোকা ভগবান' নামে অনেক প্রবন্ধ বাহির হইত এবং তাহাতে আমি কি কি জাতীয় বিবিধ প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দিতাম তাহার বর্ণনা বাহির হইত। রামকৃষ্ণ-কথামৃত-লেখক অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই আমার নিকট আসিতেন। তাঁহার সহিতও আপনার বন্ধুত্ব ছিল। ইহা ছাড়া শত শত লোক প্রত্যহ আমার বাসায় আমার নিকট আসিত। আমি আশা করি যে এই সমস্ত স্মারক বিবৃতিতে আমার কথা আপনার মনে পড়িবে। আমি বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছি। অনেক দিন ধরিয়া সময়ে অসময়ে আপনার কথা মনে করিতে আনন্দ পাইয়াছি।

---

* শ্রীমতি উমা মুখোপাধ্যায় এই অমূল্য পত্র দুইখানি কাশীবাসী ডাঃ প্রভাত চন্দ্র দাঁ মহাশয়ের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

কিন্তু আপনি কোথায় আছেন তাহা না জানায় আপনার সহিত পত্রব্যবহার করিতে পারি নাই। দৈবক্রমে অল্পদিন হইল আমাদের সুহৃৎ শ্রীবিনয় কুমার সরকারের নিকট হইতে আপনার সংবাদ জানিতে পাইয়া ও আপনি কুশলে আছেন জানিয়া এই পত্রখানি লিখিলাম। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। আপনার সম্বন্ধে এই পত্রোত্তরে যাহা কিছু লিখিবেন তাহাতেই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। বাল্যকালে আপনার আবির্ভাব আমার সম্মুখে একটি কাঞ্চনী দীপশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। স্মৃতির প্রাচীন ফলকে আজও তাহার ছায়াটুকু যেন তেমনই অম্লানভাবে জ্বলিতেছে। ইতি —

প্রণত

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ডক্টর সুরেন দাশগুপ্তের দ্বিতীয় পত্র

100, Russa Road,
(2nd Floor)
Kalighat
Calcutta
30.1.43

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ভবিষ্যতে আপনি আমাকে কখনও 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিবেন না। ইহা হইতে অসঙ্গত ও হাস্যকর কিছু হইতে পারে না । যদিও আপনাকে আমি কোনদিন পত্র লিখি নাই তথাপি আপনার সৌম্যমূর্তি ও গোস্বামীজীর সৌম্যমূর্তি আমি অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। কর্মান্তের অবসরে সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া যখন পৃথিবীর উপর নামিয়া আসে এমন কতদিন বাল্যকালের আপনাদের পুণ্যস্মৃতি ও সাহচর্যের অনুভব কোন নিবিড় গুহাচ্ছন্ন লোক হইতে আমার চক্ষুর সম্মুখে মনের অন্তরাল হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই যে স্মৃতিলোকে আপনাদের উপস্থিতি ইহা দ্বারা আমি নিবিড় অশরীরী সঙ্গসুখ অনুভব করিয়াছি —তাহা বর্তমান কর্মক্লান্ত জীবনের উপর যেন শান্তির বর্ষণধারা ফেলিয়া গিয়াছে। আপনার চিঠিতে দেখিতেছি আপনার সঙ্গে আমার আরও কয়েকবার দেখা হইয়াছে। কিন্তু সে দেখাগুলি মনে

কোথাও দানা বাঁধিতে পারে নাই, তাহা কোলাহলে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু আপনাদের যে দেখাটি আসিয়াছিল জীবনের প্রভাত সূর্যোদয়ের ন্যায় —প্রথমত শিবনারায়ণ পরমহংসের মনোহরপুকুরস্থ বৃক্ষবাটিকায় পরে আমার ও গোস্বামীজীর বাটিতে তাহার আলোক এখনও একটুও ম্লান হয় নাই। সেই সব দিনের ছোটখাটো অনেক কথা মাঝে মাঝে এখনও উঁকি দেয়। Royal Reader এর কোনও একভাগ হইতে আপনার কাছে একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম— "Dancing in a Fairy Ring"। আপনাদের সহিত সেকালের যোগটির ধ্বনি যেন ঐ line টির মধ্যে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের জীবন এখন দীর্ঘ হইতে চলিল এবং নানা দেশে নানা লোকের মধ্যে নানা লোকের ছবি ও নানা পুণ্য-চরিত্রের দ্যেতনা যখন তখন মনে ভাসিয়া ওঠে কিন্তু আপনার ও বিশেষভাবে গোস্বামীজীর যে স্মৃতিটুকু নানা পুণ্য মুহূর্তে আমার চিত্তপটে উদ্ভাসিত হয় তাহার যেন একটু বিশেষত্ব আছে। তাহা যেন ইঙ্গিতে সুদূর অতীত হইতে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত একটি আলোকচ্ছায়া সমুল্লসিত করিয়া দেয়। মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের কথা যেদিন আপনি আমাকে গোস্বামীজীর নিকট সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রথম পরিচিত করিয়া দেন। তিনি বলেন, আমার সহিত তাঁহার পূর্বে পরিচয় ছিল ও বন্ধুত্ব ছিল। তারপর চরমন্ডলীর নানা প্রশ্নোত্তরের পর তিনি আমাকে একটি কমন্ডলু ও একটি বেদানা দেন। কমন্ডলুটি এখনও আমার গৃহে সুরক্ষিত আছে। বেদানার দানাগুলি সারাজীবন বসিয়া চুষিয়া আসিতেছি— কতক বা পচিয়া গিয়াছে। এখন আসিয়া খোসায় ঠেকিয়াছে— কিন্তু কমন্ডলুটি শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্য হইতে কোন মন্দাকিনী স্রোত কমন্ডলুকে প্লুত করিয়া আমার মস্তকে এখনও নিষিক্ত হয় নাই— তাই "বসে আছি যে আশা ধরে, মনে করে নাথ তুমি লবে হরে"।

এ জীবন এতাবৎকাল পর্যন্ত মুখ্যভাবে ব্যয় করিয়াছি বিদ্যাচর্চায়! অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত আজ প্রায় ৪৫ বৎসর যাবৎ সংস্কৃত শাস্ত্রের নানা বিভাগের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অধ্যয়নের সঙ্গে অধ্যয়নের প্রতীকরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে একটি মূল্যবান গ্রন্থশালা। এই গ্রন্থশালার মধ্যে নিদ্রাকাল ব্যতিরেকে আমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যয়িত হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন "স্বাধ্যায় অধেত্যবঃ— তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণং ষড়ঙ্গ বেদোহধ্যেতব্যঃ"। আজও অধ্যয়নে ও গ্রন্থলিখনে আমার প্রীতি অতি প্রচুর তথাপি মনে হয় এই প্রীতির মূল শিকড়ে কোথাও ঘূণ ধরিয়াছে। যে শিকড় দীর্ঘকাল ধরিয়া বাড়িয়া স্থূল হইয়াছে তাহার

মূল যেন কোথাও বার্ধক্যে পচিয়া আসিতেছে যদিও প্রত্যক্ষত সে মূল এখনও অটুট রহিয়াছে। বটবৃক্ষের পুরাতন জীর্ণ মূল যেন ধ্বস্ত হইয়া উপরে নতুন শিকড় গজাইতেছে; নূতন রসের আস্বাদনের জন্য তাহা যেন অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া আকাশে বাতাসে আহারের অন্বেষণ করিতেছে। মনে হইতেছে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, মেধা ও বহুশ্রুতের দ্বারা যাহা লাভ করা যায় না তেমন জিনিষ কেমন করিয়া লাভ করা যায়— অথচ সেই জিনিষের আস্বাদে তেমন করিয়া চিত্ত ভরিয়া উঠে নাই, নূতন রসে এমন করিয়া জীবন আপ্লুত হয় নাই যাহাতে পুরাতন সমস্ত প্রীতির বন্ধন পুরাতন জীর্ণ বল্কলের ন্যায় আপন স্বভাবে আপনিই বিচ্যুত হইয়া পড়িতে পারে। কোনও পাকশালা হইতে অনেক সময়ে যেমন দেখা যায় যে উগ্র গন্ধ বিনির্গত হইয়া জিহ্বা রসাল করিয়া তোলে অথচ কোথায় যে পাকশালা, কোথায় বা সেই ভোজ্যবস্তু তাহার কোন সন্ধান নাই — এ যেন খানিকটা সেই। আজ বানপ্রস্থের সময় জীবনের যে সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছি তাহাতে সর্বপ্রথম আমার জীবনের প্রভাতে যে জ্যোতির সঙ্কেতে আপনি ও গোস্বামীজী আমার অন্তর উল্লসিত করিয়াছিলেন তাহারই কথা প্রথম মনে পড়িল। আপনি ইহলোকে আছেন কি নাই তাহা আমি জানিতাম না। হঠাৎ আপনার সন্ধান পাইলাম—সুযোগ মিলিল। আপনাকে স্মারক পত্র লিখিলাম। আপনার সহিত কবে দেখা হইবে জানি না। দেখা হইবার যে বিশেষ আবশ্যক আছে তাহাও মনে করি না। আপনার জীবন এই দীর্ঘকাল কোন পথে প্রবাহিত হইয়াছে তাহার সহিত আমার জীবনের ধারার কোন যোগসূত্র বর্তমানে আছে কিনা, আপনার চিন্তা ও বিশ্বাস, মত ও ভক্তির সহিত আমার বর্তমান জীবনের ধারার কোনও মিল আছে কিনা তাহা জানি না। জানিবার যে খুব ঔৎসুক্য আছে তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু বাল্যকালের সেই স্মৃতির মধ্যে আপনি ও গোস্বামীজী চিরন্তন হইয়া রহিয়াছেন। গোস্বামীজী ইহলোকের লীলা সংবরণ করিয়াছেন তাহাতে আমি কোনও ক্ষতি বোধ করি না। কারণ আমার জীবনের মধ্যে তাঁহার স্মৃতি চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। আমার জীবন যে পথ দিয়া তাহাকে গড়িয়া লইবার জন্য ধাবিত হইয়াছে তাহার প্রবাহ ও গতি, তাহার পন্থা ও প্রাপ্তব্যের অনুসরণ সম্পূর্ণ আমার নিজের অন্তরে। আপনাদের স্মৃতির জ্যোতিঃ আমার সেই প্রবাহের উপর প্রতিফলিত হইয়া আপনাদের অজ্ঞাতে আমার মধ্যে যে আনন্দের ছায়া ফেলে

* "আমরা সবাই" ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০০১)

তাহাতেই আমি আমাকে সার্থক মনে করি এবং আপনাদের সেই দান আপনারা এমন প্রচুর করিয়া আমাকে দিয়াছেন যাহা ফিরাইয়া লইবার অধিকার ও সামর্থ্য আপনাদের নাই— যাহা আপনাদের জীবন মরণের অতীত, যাহা জীবন হইতে জীবনান্তরে সংক্রান্ত হইয়া নূতন বর্ণমালায় নিরন্তর বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। তাহার ছায়ার আড়ালে কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনস্থ ধূলিসাৎকৃত আমার পূর্বের বাসস্থান একান্তভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আপনার সেই Curuvoisier ঘড়িটি অনেককাল হয় বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার কাঁটাটি এখনও টিকটিক করিয়া চলিতেছে। তাহার ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে গমনের শব্দ এখনও আমার কানে বাজিতেছে। বলিতেছে, "আর কত দূরে বল হে সুন্দরী, ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।" শ্রীভগবানের সেই অন্তর্যামী পুরুষের বাণী ও ইচ্ছা যেন আমার হৃদয়ে ও জীবনে জয়যুক্ত হয়— আপনার নিকট আমি এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। ইতি —

ভবদীয় ভক্তিপ্রণত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পুনশ্চ - বিনয় সরকারের সহিত কালও University তে দেখা হইয়াছিল। আমি বর্তমানে Sanskrit College-এর অধ্যক্ষতা হইতে অবসর লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণণ যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই পদে কার্য করিতেছি। আমার শরীর অপটু, রোগজীর্ণ ও একটি চক্ষু অন্ধ। আমার ন্যায় দীন ব্যক্তির পক্ষে শ্রীপরমপুরুষের করুণা ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই। আমি একান্ত নিষ্কিঞ্চন। আপনি যে চিঠিখানির কথা লিখিয়াছেন তাহার copy পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব।

পরিশিষ্ট (চ)

Causes of the Decline of the Brahmo Samaj : A Reassessment*

Haridas Mukherjee

The sixties and seventies of the 19th century represented the heyday of the Brahmo movement in Bengal, but since the late seventies and early eighties the movement, notwithstanding its singular services to the country, exhibited signs of declining popularity. Beginning as a great progressive and regenerating social force in the early decades of the 19th century spearheaded by Raja Rammohun Roy, the Brahmo Samaj lost its dynamism and creativeness towards the close of that century. Reviewing the social and historical background of the late 19th century Bengal, Sri Aurobindo observed in his serial articles on Bankim Chandra on August 27, 1894 : "Already we see the embryo of a new generation soon to be with us, whose imagination Bankim has caught and who care not for Keshab Chandra Sen and Kristo Das Pal, a generation national to a fault, loving Bengal and her new glories ... With that generation the future lies and not with Indian Unnational Congress or the Sadharan Brahmo Samaj. Already its vanguard is upon us. It has in it men of culture, men of talent, men of genius."

The first limitation of the Brahmo Samaj was that it was all through aristocratic or elitist in character, being confined to the English educated sections of the community. It could make little or no appeal to the masses of the Hindu population who generally stood outside the pale of Brahmo Samaj. As late as January, 1907, the Samaj could claim "only 4,050 members compared with 3,051 ten years earlier and out of a total population of 294,361,056 persons." [1]

Its second limitation was that its leaders and exponents in its later phases began to suffer from a sort of superiority complex. They developed an egocentric attitude and began to consider

*(1) Vide the article on "The Brahmo Samaj" published in the English daily *The Bande Mataram* (January 23, 1907) of which Sri Aurobindo was the guiding spirit. It seems the article was penned by Hemendra Prasad Ghose who was an able writer and member on the editorial staff of that paper.

themselves superior in morality and intellectuality to the general run of people of the Hindu society. They even felt that they formed a separate class of their own (the elites of society) and regarded the people as nothing but a disorganised horde or an unthinking crowd. This psychology of the leadership sapped the vitality of the Brahmo movement.

A third weakness of the Brahmo movement was its pro-Christian drift as revealed in the speeches and writings of Keshab Chandra Sen and Protap Chandra Majumdar. While Rammohun and Debendranath were eager to cure Hinduism of its existing evils and malpractices but trying at the same time to hold fast to the national moorings, Keshabchandra and his radical followers began to cut it off from the national heritage and develop it as an institution suffused with Christian ideals, the religion of the conquering people.

A fourth limitation of the Brahmo Samaj, particularly in the religious field, was its total rejection of litanies, liturgies, rites and ceremonies of prevailing Hinduism. Its God was non-anthropomorphic or a metaphysical expression of the Supreme Reality, the formless ***Brahma***. In its conception of religion, rationalism enjoyed a commanding position, and there was utter neglect of people's susceptibilities or the emotional sides of man's nature. As religion is not a mere intellectual process or philosophical dissertation but essentially an act of silent communion in solitude with one's own inmost self for cleansing and purification, for the transformation of man's entire level of existence, living and being into a higher reality, no religion on earth can ever hope to sustain itself for long without emotional or spiritual animation. In fact, no religion worth the name can ever live and thrive if it does not take due cognizance of the emotional sides of human nature which is not all rational. The Brahmo movement by its strong insistence on rationalism in religion and unceremonious rejection of traditional Hindu rites and sentiments created a void in the mind of the larger Hindu community. Its highly abstruse and metaphysical concepts appeared dry and barren to the religious temperament of the masses on whom Hinduism with its gorgeous rites, litanies and liturgies has ever cast a magic spell. It is, therefore, no wonder that the Brahmo movement after its second split in 1878 began to shrink into a sectional organization.

A fifth limitation of the Brahmo movement was that, like Buddhism of earlier times, it came closer and closer to Hinduism, thus losing its original identity. The programme of religious reform as undertaken by Keshab Chandra Sen, the foremost leader of the Brahmo Samaj in the late seventies and early eighties, indicated clearly his spirit of compromise with Hinduism. His meeting with Ramakrishna Paramhamsa of Dakshineswar (1875) was a turning point in his missionary career. The introduction of *Nagar-Sankirtan* or street-singing of religious songs, Keshabchandra's increasing leanings in later years towards Vaishnavism under the charming influence of Sri Sri Bejoy Krishna Goswami, the most saintly and spiritual character thrown up by the Brahmo movement, his belief in *Avatarhood* and his promulgation of *Nava Vidhan* or New Dispensation (1880), intensely religious in character, lend corroborating support to the contention.

Sixthly, the Brahmo movement in its later phases often showed anti-Hindu tendencies and sank into a new kind of dogmatism as was shown by Protestantism in its later course in Europe. A striking illustration of this anti-Hindu spirit is furnished by Akshoy Kumar Datta's "*Bharatbarshiya Upashak Sampradaya*" or Indian Religious Sects (1870-83) wherein every sect, barring the Brahmo Samaj, was held up to contempt and ridicule. Moreover, the Brahmo zeal for reform appeared to many a Hindu to be rather excessive, often arrogant drawing inevitably a powerful Hindu reaction against it.

Finally, we have to take into account the growth of the new nationalist sentiment in Bengal in the seventies and eighties of the 19th century. The core of the nationalist sentiment was the passion for the country and pride in the past glories of the forefathers of the race. The Young Bengal of Surendranath and Bankim was different in temper from the Young Bengal of Keshab Chandra. Keshabchandra's Young Bengal was intensely longing for social and religious reforms; while the first passion of Surendranath's Young Bengal was the passion for political reforms. In literature, the new nationalist spirit that denounced indiscriminate rejection of Indian past, found powerful and eloquent expression in the writings of Bhudev Mukherjee, Hem Chandra Banerjee, Nabin Chandra Sen, most notably in the literary works of Bankim Chandra Chatterjee. In the sphere of politics, the new spirit was

best reflected in the attitude and utterances of Surendra Nath Banerjee. Bankim's *Bangadarshan* (1872) and Surendranath's *Indian Association* (1876) were the two epoch-making landmarks in the history of Indian nationalism.[2]

The spirit of Indian nationalism invaded the religious field also. In the religious sphere the new spirit found its noblest expression in the life of Ramakrishna. His messages were broad-minded and catholic, respectful of all religions, rejecting none but accepting all as pathways of God-realization. His spiritual outpourings were in deep conformity with the Indian culture and tradition. It was the liberals and rationalists, not hide-bound conservatives or *sanatanists,* who clustered around Ramakrishna as disciples and later became the harbingers of a new democratic social and religious thought. It was not the conservatism of Ramakrishna but his catholicity of spirit and intense spirituality that weaned away many a rationalist reformer from the Brahmo fold. Keshab Sen's latter-day change in religious views (since 1880) and the emergence of Bejoy Krishna Goswami with his majestic spiritual spell weakened rather than strengthened the Bramho Samaj. The drift of Bipin Chandra Pal, Aswini Kumar Datta, Sisir Kumar Ghosh, Narendranath Datta (Vivekananda), Kali Prasad Chandra (Abhedananda), Satis Chandra Mukherjee (of the *Dawn)* etc. towards Hindu spirituality was an expression of their growing dissatisfaction with the reformers' views. The birth of aggresive Hinduism under the leadership of Dayananda Saraswati along with later Theosophist glorification of India's cultural heritage contributed not a little to the weakening of the Brahmo movement in the last quarter of the 19th century. At Vivekananda's hands the Brahmo apologetic attitude *vis-a-vis* Christianity was changed into a militant spirit when he declared in his thunderous voice to the effect that he had gone forth to the West to preach a religion of which Buddhism was a rebel child and Christianity a distant echo.

Dr. Amitabha Mukherjee is entirely right in his suggestion that among the factors contributing to the decline of the Brahmo Samaj towards the end of the 19th century was "the rising tide of aggressive religious nationalism of the Hindus which swept

(2) Haridas and Uma Mukherjee : *The Growth of Nationalism in India,* Calcutta. 1957 may be consulted for details as well as their Bengali work on *Jatiya Andolone Satishchandra Mukhopadhyay* (Cal, 1960 pp. 118-127).

everything before it in the last decade of the nineteenth century and the opening decade of the twentieth."[3] Dr. Mukherjee is also right in saying that the diversion of interests of the youthful generation inspired by Surendranath from socio-economic problems to political questions was another contributory factor in the waning influence of the Samaj in the eighties of the 19th century.

But it is very questionable whether Keshabchandra's "open proclamation of loyalty to the British Crown" had much to do with the alienation of "the rising generation of Bengalee nationalists" from the Samaj. If the youthful generation of Bengal in the eighties stood alienated from Keshab Chandra Sen, it was not so much due to Keshabchandra's proclamation of loyalty to the British *Raj* which was the order of the day, as to other causes. It needs to be noted in this connection that policital radicalism in the form of *Purna Swaraj* for India outside the structure of the British Empire was far removed from the political psychology of the Indian nationalists in general even for two decades following the birth of the Congress (1885). The patriotic leaders of that generation had accepted the British rule in India as a divine dispensation and sought the redress of specific Indian grievances within the fundamental framework of British imperialism in India. Even in 1902, Surendra Nath Banerjee in his Presidential Address at the Ahmedabad Session of the Congress gave expression to his cult of loyalty to the British *Raj* in the memorable words, "We plead for the permanence of British rule in India." The political extremism or radicalism usually associated with the names of Bipin Chandra Pal and Upadhyay Brahmabandhab during the stirring times of the Swadeshi Movement (1905-06) was hardly in evidence in their political thinking before the outbreak of the Swadeshi Movement in 1905.[4]

* (3) Edited by Dr. S. P. Sen : *Social Contents of Indian Religious Reform Movements* (Calcutta, 1978, p. 290).

* (4) Haridas and Uma Mukherjee : *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* (1958) and *Upadhyay Brahmabandhab O Bharatiya Jatiyatabad* (1961)